তিতাস একটি নদীর নাম : লোকজীবনের পাঠ-প্রতিবেদন

তাশরিক-ই-হাবিব*

[সারসংক্ষেপ : অদ্বৈত মল্লবর্মণ বাংলা সাহিত্যের সেসব বিরলপ্রজ লেখকদের একজন, যাঁরা স্বল্পায়ু জীবনে গুটিকয়েক লেখা দিয়েই নিজের নাম কালের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত করতে সমর্থ হয়েছেন। নিজে মালো পরিবারের সন্তান বিধায় বর্ণহিন্দু সমাজের সম্যক অবস্থাকে ব্যক্তিক অভিজ্ঞতাযোগে তিনি গভীরভাবে অবলোকন করেছেন। পাশাপাশি প্রতিবেশী মুসলমানদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রাকে নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যবেক্ষণসূত্রে অর্জিত অভিজ্ঞতার আলোকে উপন্যাসে গ্রন্থিত করতে তিনি ছিলেন অনুধ্যানী। কবিতা দিয়ে লেখালেখি শুরু হলেও এরপর গল্প ও প্রবন্ধে অভিনিবেশ দান, বিদেশি লেখকের উপন্যাস অনুবাদ, সাংবাদিকতা প্রভৃতিতে সম্পৃক্ত থাকলেও তিনি যে একজন জাত ঔপন্যাসিক, তা বোঝার জন্য বোদ্ধা পাঠকের *তিতাস একটি নদীর নাম* উপন্যাসটি পাঠের অভিজ্ঞতাই যথেষ্ট। তিতাসপাড়ের বাসিন্দাদের অকৃত্রিম জীবনভাষ্য ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে মহাকাব্যিক ব্যঞ্জনায় উন্নীত করে তিনি কালজয়ী কথাশিল্পীর আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। এ উপন্যাসে বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতির অন্তর্গত বিভিন্ন উপাদানের রূপায়ণ ঘটেছে। এসব উপাদানের সমাবেশে তিতাসপাড়ের লোকসমাজের পূর্ণাঙ্গ চালচিত্র অসামান্য ভাষ্যরূপ পেয়েছে এ উপন্যাসে। তিতাসপাড়ের মালো ও চাষি সম্প্রদায়ের লোকজীবন ও লোকসংস্কৃতির রূপরেখা এ প্রবন্ধে আলোচিত হবে।]

অদ্বৈত মল্লবর্মণের (১৯১৪–১৯৫১) *তিতাস একটি নদীর নাম* (১৯৫৬) নদীভিত্তিক বাংলাদেশের উপন্যাসের ধারায় নিঃসন্দেহে অনন্যসাধারণ অবস্থানে উত্তীর্ণ।[১] তিতাসপাড়ের লোকজীবন ও লোকসংস্কৃতির প্রতি অদ্বৈতের অকুণ্ঠ অনুরাগ[২], মালো সম্প্রদায়ের একজন হয়েই তাদের জীবনসংগ্রাম ও অস্তিত্বসংকটকে অনুধাবনের আন্তরিকতা[৩], সর্বোপরি প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে তাদের জীবনসংগ্রামের অনিঃশেষ চালচিত্রকে নৈর্ব্যক্তিকভাবে শিল্পভাষ্যে রূপদানের সামর্থ্য উপর্যুক্ত দাবির সহায়ক সূত্র হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। ক্ষুধা-দারিদ্র্য-অর্থনৈতিক টানাপোড়েন, শিক্ষাহীনতা প্রভৃতির সমন্বিত অভিঘাতের পাশাপাশি প্রকৃতিনির্ভর জীবিকা অবলম্বনের বাধ্যবাধকতা মালো সম্প্রদায়ের জীবনধারাকে আদ্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করে। শ্রেণিবিভক্ত বাঙালি সমাজের প্রান্তিক পর্যায়ে অবনমিত এ লোকগোষ্ঠীর প্রবঞ্চিত, বিড়ম্বিত জীবনধারার রূপায়ণে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি বরাবর সামগ্রিক, পক্ষপাতহীন। সেকারণেই শত অভাব-অনটন আর উদরপূর্তির লড়াইয়ের প্রতিবেদনেও তিনি অন্বেষণ করেন তাদের সামাজিক পরিচয় ও সংকটের অভিন্ন উৎসমূলে। সেটি নিঃসন্দেহে তাদের বহুবর্ণিল, বহুস্তরিক সাংস্কৃতিক জীবন। বহুকাল ধরে প্রচলিত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারকে নিত্যদিনের যাপিত জীবনে অনুসরণ ও প্রতিপালনে তারা অত্যন্ত সচেতন, একনিষ্ঠ। এর সাক্ষ্য রয়েছে উপন্যাসভুক্ত কুশীলবদের আচার-আচরণে, পরস্পরের সঙ্গে আলাপ ও মেলামেশায় জীবিকানির্বাহ-প্রণালিতে, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও পারিবারিক অনুশাসনে, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক আয়োজনে, ভাবনা ও অন্তর্বাস্তবতার সম্মিলনে গড়ে ওঠা লোকজসমষ্টিচেতনার বিস্তৃত পরিমণ্ডলে। তিতাসপাড়ের লোকগোষ্ঠী হিসেবে শুধু মালো সম্প্রদায়ের চালচিত্র উপস্থাপনেই তিনি লেখনীকে সীমাবদ্ধ রাখেননি। বরং এর

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

পাশাপাশি তাদের প্রতিবেশী এবং নিত্যদিনের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখের সঙ্গী ভূমিনির্ভর মুসলমান কৃষকসমাজের বৃত্তান্তও সমান্তরালভাবে এ উপন্যাসে উপস্থাপিত। লোকসংস্কৃতির বিস্তৃত ক্যানভাসে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সমাজের প্রান্তিক গোষ্ঠীভুক্ত মানুষের জীবনচর্যার পূর্ণাঙ্গ, অখণ্ডিত বয়ানের এরূপ দৃষ্টান্ত বাংলা উপন্যাসে নিঃসন্দেহে বিরল, অভূতপূর্ব।

১. লোকবিশ্বাস

তিতাসপাড়ের মালো ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের বাসিন্দাদের মধ্যে বিভিন্ন লোকবিশ্বাস প্রচলিত। আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, এসব বিশ্বাস বহুলাংশেই যুক্তিহীন, কাল্পনিক ধারণাপ্রসূত ও বাস্তবতাবিবর্জিত। কিন্তু অশিক্ষিত, দরিদ্র, নিয়তিবাদী এবং প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল হয়ে জীবিকানির্বাহে বাধ্য লোকসমাজের বাসিন্দাদের নিকট এসব বিশ্বাস মোটেই তাৎপর্যহীন নয়। কেননা, ঘটে চলা বিভিন্ন ঘটনার কার্যকারণ সম্পর্ক ব্যাখ্যার অপেক্ষাকৃত সরল এবং নিজস্ব প্রয়াস সংহত সমাজের সাধারণ প্রবণতা। এতে তাদের নিজস্ব চিন্তা এবং কল্পনার সামর্থ্যও প্রতিফলিত হয়। তাছাড়া এসব বিশ্বাস প্রায়শই পূর্বসূরিদের নিকট থেকে অর্জিত বলে তা মান্য করার ঝোঁকও তাদের মধ্যে প্রবল। এ উপন্যাসেও অনুরূপ দৃষ্টান্ত লক্ষণীয়। যেমন 'প্রবাস খণ্ড' পরিচ্ছেদে কিশোর, সুবল ও তিলকচাঁদ নৌকায় চড়ে মেঘনার বড়ো গাঙ সংলগ্ন শুকদেবপুর গ্রামের উজানিনগর খলার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। একপর্যায়ে নদীর প্রবল স্রোতের মধ্যে বৈঠা বাইতে গিয়ে অল্পবয়সি সুবল কিছুটা ভীত হলে কিশোর তাকে সাহস জোগায়, 'না সুবলা, ডরাইস না। গাঙের ডর মাইঝ গাঙে না, গাঙের বিপদ পারের কাছে। বা'র গাঙে মা গঙ্গা থাকে, বিপদে নাইয়ারে রক্ষা করে' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪১৮)। বলাবাহুল্য, এ লোকবিশ্বাস কিশোরের ব্যক্তিগত ধারণাপ্রসূত নয়। পরিবার ও সমাজের বাসিন্দাদের কাছ থেকে শোনা বিশ্বাসকে সেও প্রাত্যহিক প্রয়োজন মেটানোর সংকটকালীন মুহূর্তে অবলম্বন করতে চায় প্রতিকূলতা অতিক্রমের তাগিদে। কেননা, সেও ভীত হয়েছিল অকূলবিস্তারী মেঘনার প্রবল স্রোতে নৌকা চালাতে গিয়ে। সে জানে, নদীতে যাত্রাকালে অনেকেই ডুবে মারা যায়। অর্থাৎ মা গঙ্গার কৃপায় সকলে বিপদের মুহূর্তে রক্ষা পায় না। তবু, ব্যক্তিগত সংকট মোকাবেলার জন্য এ ধরনের বিশ্বাসের ওপর ভরসা করা লোকসমাজের বাসিন্দাদের স্বভাবেরই অংশ। আবার বাঁশিরাম মোড়ল তার বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণের একপর্যায়ে সে কিশোরদের ধর্মীয় ঐতিহ্যের পরিচয় জানতে চায়। কিশোর জানায়, তারা কৃষ্ণের অনুসারী। একথা শুনে বাঁশিরাম জানায়, স্বয়ং কৃষ্ণই তাদের মিলিয়ে দিয়েছে। কেননা, বাঁশিরামও একই সম্প্রদায়ভুক্ত। এভাবেই লোকবিশ্বাসের ভিত্তি জনমনে বিস্তৃত হয়। কাকতালীয়ভাবে মিলে যাওয়া ঘটনাকেও লোকবিশ্বাস হিসেবে বিবেচনা লোকমানুষের বিশেষ প্রবণতা। 'রামধনু' পরিচ্ছেদে লক্ষণীয়, মেয়েদের মধ্যে এমন ধারণা প্রচলিত যে, 'রামের হাতের ধেনু, লক্ষ্মণের হাতের ছিলা, যেইখানের ধেনু সেইখানে গিয়া মিলা'— ছড়াটি আবৃত্তি করলে রংধনু আকাশে মিলিয়ে যায়। সেকারণেই ছোটবেলায় বনমালী উদয়তারাকে নতুন কাচের চুরি কিনে দিলে সে তা পরিধান করে এ ছড়াটি আবৃত্তি করতো। বাসন্তীর কাছ থেকে অনন্ত মালো লোকসমাজে প্রচলিত বিভিন্ন বিশ্বাস সম্পর্কে অবহিত হয়েছিল। মৃত মানুষের বিদেহী আত্মা যে প্রিয়জনের আশেপাশে ঘোরাফেরা করে, এমনকি ছলে-বলে ক্ষতি করতে চায়, অনন্ত এ বিষয়ে তার কাছ থেকে ধারণা পায়।

> মা যদি মরিয়া যায়, তবে সে মা আর মা থাকে না, শত্তুর হইয়া যায়। মরিয়া যেখানে চলিয়া গিয়াছে, ছেলেকে সেখানে লইয়া যাইবার জন্য সবসময়েই তার লক্ষ্য থাকে। অন্তত শ্রাদ্ধশান্তি না হওয়া পর্যন্ত একমাস তো খুব ভয়ে ভয়ে কাটাইতে হয়। তার আত্মা তখন ছেলের চারিপাশে ঘুরিয়া বেড়ায় কি না। একা পাইলে, কিংবা আঁধারে, কি বট বা হিজল গাছের তলায় পাইলে, কিংবা নদীর পারে পাইলে, কাছে কেউ না থাকিলে লইয়া যায়। নিয়া মারিয়া ফেলে। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৯২)

অনন্তের ধারণা, তার মৃত মা কাক হয়ে তাকে দেখতে আসে। অন্য কাকের সঙ্গে সেও আসে খাবার খেতে। কিন্তু যারা মারা যায়, তারা জীবিত মানুষের সঙ্গে কথা বলতে পারে না। অনন্ত তার মাকে দেখলে কথা বলতে চাইবে বলেই তার মা উড়ে চলে যায়, এ ধরনের শিশুতোষ রূপকথাও তার কাছে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে বাসন্তীর নিকট থেকে শোনা গালগল্পের কারণে। পাশাপাশি 'লোকে তেপথা পথে রোগীকে স্নান করায়, ফুল দিয়া রাখে। যে পা দিবে সেই মরিবে' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৯৪)। লোকসমাজে এ ধরনের বিশ্বাসও যে প্রচলিত, তা লক্ষণীয় বাসন্তীর মার ক্ষুব্ধ মনোভঙ্গিতে। পরের ছেলে অনন্তকে লালনপালন করতে বাসন্তীর যে আগ্রহ, তা তার পছন্দ নয়। নিজের দারিদ্র্যপীড়িত সংসারে একজন বাড়তি মানুষ থাকলে তার খরচ ও ভরণপোষণের বন্দোবস্ত করতে বাসন্তীর বাপের পরিশ্রম বহুলাংশে বেড়ে যায়। সেকারণেই বাসন্তীর বৃদ্ধ বাবা-মা অনন্তকে বাড়ি থেকে বিতাড়িত করতে চায়। অনন্তের অমঙ্গল প্রত্যাশায় বাসন্তীর মা চায়, সে যেন একদিন ভুলবশত তেপথা পথে যায় এবং তার বাড়িতে আশ্রয় নিতে না পারে। লোকবিশ্বাসের অন্যতম মাধ্যম হলো স্বপ্ন। অবচেতনলোকে সঞ্চিত বিচিত্র বিশ্বাস ও ঘটনা স্বপ্নে রূপক-প্রতীকী তাৎপর্যে আভাসিত হয়। 'ভাসমান' পরিচ্ছেদে তিতাস নদী শুকিয়ে যাবার পরিণতিতে এর তীরে বসবাসরত মালোদের অস্তিত্বসংকটের ইঙ্গিত প্রকাশিত হয়েছে রাধাচরণ মালোর জবানিতে– 'দেখলাম স্বপ্ন, তিতাস শুখাইয়া গেছে। এই স্বপ্ন কি মিছা হইতে পারে। দেখলাম গাঙে বিশ-হাতি বাঁশ ডুবাইয়া তলা ছোঁয়া যায় না, সেই গাঙের মাঝখান দিয়া ছোটো একটা মানুষ হাঁইট্যা চলছে। যে যে জায়গা দিয়া সে গেছে, একটু পরেই দেখলাম সেই সগল জায়গায় আর জল নাই; শুকনা। ঠনঠন করতাছে। বুকটা ছাৎ কইরা উঠল। হাত পাও কাঁপতে লাগল। নাওয়ে আমি একলা। এমুন ডর করতে লাগল যে একবার চিৎকার দিয়া উঠলাম' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৫৫২)। তিতাসের বুকে জেগে ওঠা চর সম্পর্কে ধারণা লাভের পরিণতিতে জীবিকা বিঘ্নিত হবার বিপন্নতাবোধই তাকে তাড়িত করেছে, যা এ স্বপ্নদৃশ্যে রূপায়িত।

২. লোকসংস্কার

এ উপন্যাসে তিতাসপাড়ের হিন্দু মালো ও মুসলমান কৃষকদের মধ্যে প্রচলিত বিভিন্ন লোকসংস্কারের দৃষ্টান্ত লক্ষণীয়। কিছু সংস্কারের সঙ্গে লৌকিক ধর্মীয় বিশ্বাস ও মূল্যবোধের নিবিড় সংযোগ রয়েছে। যেমন– 'প্রবাস খণ্ড' পরিচ্ছেদে ডাকাত আক্রমণের পর অনন্তের মা নদীতে লাফিয়ে আত্মরক্ষা করলেও আকস্মিকভাবে আরেক অচেনা নারীর মৃতদেহ নৌকার কাছে দেখে তিলক 'রাম' নাম সম্বোধন করে। তেমনিভাবে 'ভাসমান' পরিচ্ছেদে রাধাচরণ মালো তিতাস নদী শুকিয়ে যাবার দুঃস্বপ্ন দেখে আতঙ্কিত অবস্থায় তিনবার 'রাম' নাম উচ্চারণ করে ভয় কাটায়। গোকর্ণঘাট গ্রামে যাত্রাকালে অনন্তর মা গৌরাঙ্গের ভিটাসংলগ্ন তুলসী গাছকে প্রণাম করে। আবার নৌকায় উঠে সে নৌকাকেও প্রণাম করলে তার ছেলে অনন্তও মায়ের

অনুসরণে একই আচরণ করে। গৌরাঙ্গ 'গঙ্গা'র নাম স্মরণ করে লগি ঠেলে নৌযাত্রা করে। কিশোর ও সুবলকে নিয়ে প্রবাসে যাত্রাকালে তিলকচাঁদ পাঁচপির বদরের ধ্বনি দিয়ে নৌকার লগি চালায়। হিন্দু মালোদেরও মুসলমান পিরের নাম স্মরণের প্রবণতা থেকে বোঝা যায়, দীর্ঘদিন পাশাপাশি বসবাস করায় একের বিশ্বাস-সংস্কার-অভ্যাস ও রীতিনীতি অন্যকেও প্রভাবিত করেছে, যার অন্তরালবর্তী উদ্দেশ্য হলো যে কোনোভাবেই হোক, কাজে সফল হওয়া এবং সংকটময় পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে তা থেকে উদ্ধার পাওয়া। কোনো কাজ শুরু করার আগে নিজ ধর্মের বিশেষ ভাবমূর্তিসম্পন্ন কারো নাম স্মরণও লোকসংস্কারের অন্তর্গত। এ উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদে লক্ষণীয়, অবস্থাপন্ন গৃহস্থ জোবেদ আলীর তিন ছেলে নদীর ওপারের চরে আলু রোপণ করে। তারা নদীপথে গন্তব্যে পৌঁছতে 'আলী'র নাম স্মরণ করে নদীতে নৌকা ভাসায়। আবার তাদের বাড়ির দুই বাঁধা কামলা করমালী ও বন্দেআলী 'আল্লা আল্লা মোমিন মোমিন' উচ্চারণপূর্বক গৃহপালিত গরুগুলোকে সাঁতার কাটিয়ে নদী পার করিয়ে চরে আবাদের কাজে লাগায়। অনুরূপ দৃষ্টান্ত লক্ষণীয় 'নয়া বসত' পরিচ্ছেদে বিবৃত গৌরাঙ্গসুন্দরের আচরণে। সে নদীতে নৌকা ভাসানোর সময় 'গঙ্গা মা'-র নাম স্মরণ করে। নদীপথে কোনো প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখোমুখি হলে আত্মরক্ষার তাড়নাবশত স্বীয় ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে এ ধরনের লোকসংস্কারের প্রচলন ঘটে। হিন্দু বিবাহিত নারীর ধর্মীয় লোকসংস্কার মান্য করার বিধান হিসেবে হাতে শাখা, কপালে সিঁদুর পরিধানের অনুশাসন রয়েছে। বিধবা হলে এ বেশ ও রঙিন শাড়ি ছেড়ে তাকে আজীবন সাদা শাড়ি পরতে হয়। 'নয়া বসত' পরিচ্ছেদে লক্ষণীয়, অনন্তের মা শ্বশুরবাড়ি আসার পথে ডাকাতের দ্বারা আক্রান্ত হলে নদীতে লাফিয়ে আত্মরক্ষা করে। গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ তাকে উদ্ধার করে নিজেদের পরিবারে আশ্রয় দেয়। কিন্তু সেই নারীর বৃত্তান্ত শুনে গৌরাঙ্গ তার পরনের বেশ ছাড়িয়ে বিধবা নারীর আভরণ পরায়। কারণ, ধর্মীয় বিধান লঙ্ঘন শাস্ত্রে মহাপাপ হিসেবে বিবেচিত। তাই গৌরাঙ্গ এ অভিযোগে অভিযুক্ত হতে অসম্মত। ধর্মীয় অনুশাসন লোকসমাজে কতটা প্রভাব বিস্তারে সমর্থ, এ ঘটনা এরই সাক্ষ্যবহ। আবার, 'রাঙা নাও' পরিচ্ছেদে লক্ষণীয়, সংসারের কাজ করতে গিয়ে অসতর্কতাবশত হাতে পরিহিত কয়েকটি চুড়ি ভেঙে যাওয়ায় রমুর মা খুশি উদ্বিগ্ন হয়। কারণ তার শ্বশুর কাদির মিয়া ব্যাপারটি জানলে নির্ঘাত তিরস্কার করবে । আর বাঙালি গ্রামীণ মুসলমান সমাজেও গৃহবধূর হাত খালি রাখা নিষিদ্ধ। সম্ভবত প্রতিবেশী হিন্দু নারীদের হাতে শাখা পরার বাধ্যতামূলক নির্দেশ এভাবেই মুসলমান সমাজে সম্প্রসারিত হয়েছে। গৃহবধূর হাত, নাক গলা ও কানে সাধ্যমত অলংকার পরিধানের সংস্কারও এভাবেই বোধহয় প্রচলিত হয়েছে। 'জন্ম মৃত্যু বিবাহ' পরিচ্ছেদে উত্তরায়ণ সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে পিঠা বানানোর আয়োজনে বাসন্তী খোলায় বানানো প্রথম পিঠাটি রাধামাধবকে পরিবেশনের জন্য রেখে দেয়। নজর লাগা বা অপদৃষ্টি, কুদৃষ্টি সংক্রান্ত লোকসংস্কারও এ উপন্যাসে লক্ষণীয়। কারো প্রলুব্ধকর দৃষ্টির জন্য ক্ষতি বা অমঙ্গলের আশঙ্কা থেকে এ ধরনের সংস্কারের উদ্ভব ঘটেছে। 'প্রবাস খণ্ড' পরিচ্ছেদে নববিবাহিত কিশোর তার স্ত্রীর প্রেমে বিমুগ্ধ বলেই বাড়ি ফেরার পথে নৌকায় তাকে বারবার দেখতে চায়। কিন্তু নদীপথে ডাকাতের আক্রমণের আশঙ্কাবশত তিলকচাঁদ কিশোরের স্ত্রীকে নৌকারা পাটাতনে লুকিয়ে রাখার বন্দোবস্ত করে। সে কিশোরকে সতর্ক করে, 'নাওয়ের ডরার ভিতরে নজর লাগাইও না কিন্তুক' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৩৬)। লোকসমাজে পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ক বিভিন্ন আদেশ ও নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। পরিবারের বয়স্ক ও মান্য ব্যক্তিদের নাম ধরে সম্বোধন না করা, কারো মৃত্যু ঘটলে সরাসরি না বলে ভিন্নভাবে বিষয়টির উপস্থাপন এসবই লোকসংস্কারের অন্তর্গত। 'নয়া বসত' পরিচ্ছেদে

অনন্তের মায়ের বাড়িতে আগত প্রতিবেশী বর্ষীয়সী নারীরা আলাপকালে একজন পান খেতে খেতে জানায়, সে খুব বেশি বটপাতা খায়। অনন্তের মা একথা শুনে অবাক হলে আরেকজন তখন জানায় 'তাইনের শ্বশুরের নাম পাণ্ডব। পান কইতে পারে না, পানেরে কয় বটপাতা' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৪৬)। শ্বশুরকে পরিবারের গৃহকর্তা তথা বটবৃক্ষ বিবেচনায় 'বটঠাকুর' নামও বাঙালি গ্রামীণ লোকসমাজে প্রচলিত। তাই তার প্রতি শ্রদ্ধাবশত পানের পরিবর্তে 'বট' নামকরণ থেকে এ ধরনের লোকসংস্কারের অন্তরালে সক্রিয় বিশেষ সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়, যার অন্তরালে পুরুষতন্ত্রের আধিপত্যসূচক মনোভাব জোরালোভাবে বিদ্যমান। 'রামধনু' পরিচ্ছেদেও অনুরূপ দৃষ্টান্ত রয়েছে। 'উদয়তারার এক ননাসের নাম ছিল মনসা। তাই মনসাপূজা বলিতে পারে না। স্বামী যেমন মান্য, স্বামীর বড় বোনও তেমনি মান্য' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৫১২)। একারণে সে মনসা পূজাকে 'শাওনাই পূজা' হিসেবে সম্বোধন করে। কেননা, শ্রাবণ মাসে এ পূজা করা হয়। বিধবার বেশে অনন্তর মাকে দেখে বাসন্তী অনন্তের বাবার মৃত্যুর বৃত্তান্ত জানতে সরাসরি 'মৃত্যু' শব্দটি ব্যবহার না করে বলে, 'ছাওয়ালের বাপ কবে স্বগগে গেল দিদি' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৪৮)। এভাবে অপেক্ষাকৃত সহনীয় পর্যায়ে ব্যাপারটিকে উপস্থাপনের শিক্ষাও লোকসমাজে প্রচলিত সংস্কারবিশেষ। আবার স্বামীর নাম উচ্চারণও নারীদের জন্য নিষিদ্ধ বলে সন্তানের পিতার পরিচয়ে তাকে সম্বোধনের ব্যাপারটিও এ সংলাপে প্রকাশিত। পারিবারিক সংস্কার হিসেবে পর্দাপ্রথা মান্য করাও লোকসমাজের রীতি। যেমন বহুদিন পর বনমালীর বাড়িতে তার বিবাহিত তিন বোন এবং তাদের স্বামীরা উপস্থিত হয়। ছোটো বোন আসমানতারার সঙ্গে তার স্বামী থাকায় বড়ো বোন নয়নতারা ও মেজো বোন উদয়তারা দ্রুত ঘোমটা টেনে কপাল ঢাকে। 'কেবল আসমানতারার ঘোমটা কপালের নিচে নামিল। বড়ো বোনদের দুর্দশা দেখিয়া সে মৃদু হাস্য করিতে লাগিল' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৫০৭)। সন্ধ্যালগ্নে ঘরে প্রদীপ জ্বালাতে হয়। এসময় ঘর অন্ধকার রাখা অমঙ্গলজনক, এমন সংস্কার অত্যন্ত প্রাচীন। সেকারণে অনন্তের মা ঘরে প্রদীপ জ্বালানোর প্রয়োজন না থাকলেও সংস্কারবশত তা জ্বেলে সঙ্গে সঙ্গে নিভিয়ে দেয়। এরপর বাসন্তীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে পিঠা বানাতে কিশোর অর্থাৎ তার পাগল স্বামীর বাড়ি যায়। অভিশাপ দেওয়া লোকসমাজের প্রাচীন সংস্কারের অন্তর্গত। এ উপন্যাসে এর একাধিক দৃষ্টান্ত রয়েছে। দয়ালচাঁদের সঙ্গে কালোবরণের ভাইয়ের বিবাদের মূলে ছিল পুরুষতন্ত্রের ধারক তথা ছেলে সন্তান সম্পর্কিত বিরোধ। দয়ালচাঁদের মতে, অসুস্থ অবস্থায় স্ত্রী মুখে জল দেয়। আর 'পুত ত কুত্তার মুত' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৬২)। কিছুদিন আগেই পুত্রের জনক হওয়া কালোচাঁদের ভাই এ মন্তব্য শুনে অবিবাহিত দয়ালচাঁদকে 'আটকুঁড়ার রাজা' সম্বোধন করে। পিতৃত্বহীনকার অপবাদে অপমানিত দয়ালচাঁদ কালোবরণের ভাইকে অভিশাপ দেয়, 'অহন থাইক্যা তোরেও যেন ঐশ্বরে আটকুড়া বানাইয়া রাখে' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৬২)। অনন্তের মার মৃত্যুর পর বাসন্তী অনন্তকে নিজের পরিবারে রাখলেও তার বৃদ্ধ বাবা-মার এতে সম্মতি ছিল না। একপর্যায়ে সে এ নিয়ে মায়ের সঙ্গে কলহে, এমনকি হাতাহাতিতে লিপ্ত হয়। অসহায় এতিম বালক অনন্তের এক্ষেত্রে কিছুই করার ছিল না। তবু রাগের বশে মায়ের সঙ্গে অশোভন আচরণের পরিণতিতে গ্লানিবশত অনন্তের প্রতি বাসন্তীর ক্রোধ তীব্র হয়ে ওঠে। তাই সে তাকে অভিশাপ দেয় 'শত্তুর, তুই বাইর হ। এই ঘরে তুই ভাত খাস ত তোর সাত গুষ্ঠির মাথা খাস। তোর লাগি আমার মায়েরে মারলাম। তুই আমার কি, ঠ্যাঙ্গের তলা, পায়ের ধূলা। যা যা অখনই যা, যমের মুখে যা। ডাকিনী যোগিনীর মুখে যা, কালীর মুখে যা। ধর্মে যেন আর তোরে ফিরাইয়া না আনে। চোখের মাথা নাকের মাথা খাইয়া যেখানে যমে টানে, সেইখানে যা। আমার সামনে আর মুখ দেখাইস না। তোর মা গেছে যে-

পথে, তুইও সেই পথে যা' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৯৭)। বাসন্তীর মা অনন্তকে পরের ছেলে ভেবে নিজ সংসারে ঠাঁই দিতে চায়নি। তার প্রতি বাসন্তীর মমত্বকে আদিখ্যেতা মনে হয় বলেই সেই বৃদ্ধা অকপটে উচ্চারণ করে 'শত্তুর শত্তুর। ইটা আমার শত্তুর। অখনই মরুক। সুবচনীর পূজা করুম' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৯২)। 'রামধনু' পরিচ্ছেদে লেনদেন সংক্রান্ত লোকসংস্কারের পরিচয় লক্ষণীয়। কাদির খেতের আলু বিক্রির জন্য ছেলে ছাদিরকে নিয়ে হাটে আসে। ব্যবসায়ীদের মধ্যে এ ধরনের সংস্কার প্রচলিত, নিজের পণ্য বিক্রি শুরু হওয়ার আগে কাউকে ধার দিতে বা দান করতে নেই। এতে নাকি ব্যবসা মার খায়। সেদিন হাটে আগত দরিদ্র বালকদের দেখে আলু বিক্রি হওয়ার আগেই কাদির মমতাবশত কিছু কাটা আলু তাদের দিলে ছাদির ক্ষুব্ধ কণ্ঠে জানায়, 'না করলাম বোয়ানি, না করলাম সাইত; তুমি বাপ অখনই এইভাবে দিতে লাগছ' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৮৭)। পূর্বপুরুষের ভিটায় আমৃত্যু বসবাসের ইচ্ছা লোকসংস্কারভুক্ত হলেও এর অন্তরালে নিজ পরিবারের প্রতি মমত্ববোধ ও ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ প্রবল। গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ অনন্তের মায়ের সঙ্গে গোকর্ণঘাট গ্রামে নতুন করে বসবাসের ব্যাপারে যে অনাগ্রহ প্রকাশ করে, এটিই এর মূল কারণ। আজন্মলালিত নাড়ির টানকে তারা অস্বীকার করতে পারে না। 'তারাও যদি এ-নদীর পারে ঘর বাঁধিত! কিন্তু জন্মভিটার এমনি তাদের মায়া, বুড়া হইয়াছে, সব ছাড়িবে, তবু জন্মভিটা ছাড়িবে না' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৪৩)। নিজের শেকড়কে কখনো ছিন্ন করতে নেই, এ ধরনের লোকসংস্কারও সম্ভবত এ ঐতিহ্যকে অনুসরণসূত্রেই উদ্ভূত। দিব্যি দেওয়ার দৃষ্টান্ত রয়েছে সুবলের বাবা-মায়ের কলহের বৃত্তান্তে। সুবলের বাপ গগন মালোর আর্থিক অসংগতি আর পরিশ্রমবিমুখতার কারণে আজীবন পরের ওপর নির্ভরশীল হবার বাধ্যবাধকতা তার স্ত্রীকে প্রতিনিয়ত বিক্ষিপ্ত করত। কারণ, 'যৌবনে সুবলের মা ভর্ৎসনা করিত, এমন টুলাইন্যা গিরস্তি কত দিন চালাইবা! নাও করবা, জাল করবা, সাউকারি কইরা সংসার চালাইবা। এই কথা আমার বাপের কাছে তিন সত্য কইরা তবে ত আমারে বিয়া করতে পারছ। স্মরণ হয় না কেন?' গগনচন্দ্র নিজে এ কাজে সফল না হলেও ছেলে সুবলের ওপর ভরসা থাকায় প্রত্যুত্তরে সে স্ত্রীকে জানাত, 'আমার সুবল আছে। আমি ত করতাম পারলাম না, নাও-জাল আমার সুবলে করব। অত ভেন্ ভেন্ করিস না' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪১৫)। বশীকরণ আদিম লোকসংস্কারের দৃষ্টান্ত, যা বিশেষভাবে বেদে, ফকির, কবিরাজ, সন্ন্যাসীদের মধ্যে প্রচলিত। অর্থের বিনিময়ে সংকটাপন্ন ব্যক্তির দুর্দশা মোচনের লক্ষে জাদু, তন্ত্র-মন্ত্র-চালান, জড়িবুটি, শিকড় প্রভৃতিকে অবলম্বন গুপ্তবিদ্যার চর্চায় সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের পেশাগত কাজ। তাদের অলৌকিক শক্তি সম্পর্কে বিভিন্ন গালগল্প-কিংবদন্তি লোকসমাজে প্রচলিত। 'নয়াবসত' পরিচ্ছেদে অনন্তের মার বাড়িতে আগত প্রতিবেশী নারীদের আলাপে এ প্রসঙ্গ বিবৃত হয়—

> একজন গল্পের ঝাঁপি খুলিল, 'আমার শ্বশুরের অনেক কিচ্ছা আছে। তুমরি খেলা জানত। উঠানের দুই দিকে দুই উস্তাদ খাড়াইত। একজন মন্ত্র পইড়া সাপ চালান দিত, আরেকজন ময়ূর চালাইয়া সেই সপ্প সংহার করত। সেই মন্ত্র জানা না থাকলে মরণ। সেইজন আবার ফিরতি আগুন চালান দিত, অন্য একজন বরুণ মন্ত্রে মেঘ নামাইয়া আগুন নিভাইত। একবার কামরূপ কামিখ্যা হইতে এক উস্তাদ বাদ্যানী আইল আমার শ্বশুরের লগে তুমরি খেলতে। পরথম খেলা হইল গাওয়ের আর এক উস্তাদের লগে। বাদ্যানী সরষার মধ্যে মন্ত্র পইড়া উস্তাদের পরাণ টিপ্যা ধরল— বাদ্যানী সরষাবান্ধা গিরোর মধ্যে টিপ দেয়, আর উস্তাদের নাক দিয়া গল গল কইরা রক্ত পড়ে। উস্তাদ এর পাল্টা মন্ত্র জানত না। আমার শ্বশুর আছিল কাছেই। বাদ্যানীরে এক ধাক্কায় মাটিতে ফালাইয়া সরষা-বন্ধন খুইল্যা উস্তাদরে বাঁচাইল। বাদ্যানী রাইগ্যা আগুন। কইল, 'বাপের বেটা হওত, এই মারলাম ভীমরুল বাণ, বাঁচাও নিজেরে।' আমার শ্বশুর ধুলাবৃষ্টি বাণে সব ভীমরুলকে কানা কইরা দিল, আর পাল্টা এমন এক বাণ মারল— বাদ্যানীর পিন্ধনের শাড়ি কেবল উপরের দিকে উঠে,

> কেবল উপরের দিকে উঠে। দুই হাতে যতই নীচের দিকে টাইন্যা রাখতে চায়, শাড়ি ততই ফরাত কইরা গিয়া উপরে উঠে। শেষে বাদ্যানী এক দৌড়ে তার নাওয়ের ভিতরে গিয়া লাজ বাঁচাইল। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৪৭)

৩. লোকাচার

এ উপন্যাসে বিভিন্ন ধরনের লোকাচারের উল্লেখ রয়েছে। নবজাতক শিশুর জন্মগ্রহণ থেকে তাকে মুখে খাবার তুলে দেওয়া পর্যন্ত বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে, বিয়ের অনুষ্ঠানের তথা উৎসবময়তার সঙ্গে লোকাচারের সম্পৃক্ততা এতটাই অচ্ছেদ্য যে, এদেরকে পৃথক করা চলে না। তবে সামাজিক আচারের মধ্যে কুটুম্বিতা, অচেনা মানুষকে আপন করে নিতে বিভিন্ন আচার পালন এসবও এর অন্তর্গত। বাঁশিরাম মোড়লের বাড়িতে কিশোর, সুবল ও তিলকচাঁদের নিমন্ত্রণ, উত্তরায়ন সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে মালোপাড়ার বাসিন্দাদের একের বাড়িতে অন্যের নিমন্ত্রণ প্রভৃতি কুটুম সংক্রান্ত লোকাচারের দৃষ্টান্ত। গোকর্ণঘাট গ্রামে বসবাসের জন্য এলে অনন্তের মাকে গ্রামের নারীমহলের আপন করে নেওয়ার চেষ্টা, পান সুপারি খেতে চাওয়া ও ছল করে তাকে বিব্রত করার মাধ্যমে নিজেদেরই সেসব বায়না মিটিয়ে তাকে কাছে টানা প্রভৃতি ঘটনায় লোকাচারের পরিচয় পাওয়া যায়। কুমারী বয়সে বাসন্তীর পালিত মাঘমণ্ডলের অনুষ্ঠানেও লোকাচারের পরিচয় রয়েছে বালকদের খাদ্য বিতরণের বিবরণে। মায়ের মৃত্যুর পর অনন্ত যে পোশাকে সজ্জিত হয় এবং যে কৃত্য পালন করে, এতে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সমান্তরালে লোকাচারও উপস্থিত। হবিষ্য খাওয়া ও শ্রাদ্ধ করা এর দৃষ্টান্ত। বাসন্তী আলো চাল দিয়ে মালসায় জাউ রান্না করে। সে কলার খোল কেটে সাতটি ডিঙ্গা বানায়। এতে জাউ ও কলা সাজিয়ে তুলসীতলায় নিবেদন করা হয়। স্নান শেষে অনন্ত এগুলোতে জল দেয়। এরপর সে সেখান থেকে সরে গেলে কাকেরা এসে তা খায়। এসবই প্রচলিত লোকসংস্কারের অন্তর্গত। এর মূল ভিত্তি হলো মৃত ব্যক্তি কাকের রূপ ধরে এসে এসব খেয়ে যায়, এ ধরনের বিশ্বাস। তাই যেদিন কাক আসে না, সেদিন অনন্তকেই ডোঙা হাতে নিয়ে কাকদের ডাকতে হয়। এক মাস ধরে এ লোকাচার পালন করা হয়। এর আগে মৃত অনন্তের মার পারলৌকিক কল্যাণার্থেও শ্রাদ্ধ করা হয়। এতেও লৌকিক ধর্মাচারের বিভিন্ন দিক পরিস্ফুট হয়েছে–

> শ্রাদ্ধের দিন অনেক নারী দেখিতে আসিল। সেও আসিল। নাপিত আসিয়া অনন্তকে মস্তক মুণ্ডন করিয়া গেল। অনন্ত কতকগুলি খড়ের উপর শুইত, সেই খড়গুলি, হাতের আধছেঁড়া নিত্যসঙ্গী কুশাসনখানা, কাঁধের ও কটিদেশের মাঠা-কাপড়ের চিলতা দুইখানা সেইনারীর কথামত নদীতীরে ঘাটের একটু দূরে কাদায় পুঁতিয়া স্নান করিয়া আসিল। পুরোহিত চাউলভরা পাঁচটি মালসাতে মন্ত্র পড়িয়া অনন্তর মাতৃশ্রাদ্ধ সমাধান করিত। ... লম্বা একটা খোলে ভাতব্যঞ্জন সাজাইয়া সুবলার বউ বলিল, 'রাঁড়িরে শেষ খাওন খাওয়াইয়া দেই, আর ত কোন দিন খাইতে আইব না। ... খোলের এককোণে একটু পান সুপারি, একটু তামাক টিকাও দেওয়া হইল। ... অনন্ত ভাত ব্যঞ্জন ভর্তি খোলটা হাতে করিয়া নদীর পারের দিকে চলিল, সঙ্গে চলিল সেই স্ত্রীলোকটি। সে নির্দেশ দিল, 'না-জল না-শুক্‌না, এমুন জায়াগত রাইখ্যা পাছ ফিরা আইয়া পড়, আর পিছনের দিকে চাইস না। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৯৪)

কিশোর ও তার হবু স্ত্রীর প্রণয় বাস্তবায়িত হয় পরিবার কর্তৃক বিয়ে প্রদানের সিদ্ধান্তকে কার্যকর করার মাধ্যমে। বাঁশিরাম মোড়লের স্ত্রীর মধ্যস্থতায় এ কাজ সম্পন্ন হয়। মোড়লের আদেশে কিশোর তার স্ত্রীর কাছে গিয়ে প্রণাম জানালে তাকে একটি ঘরের ভেতর নিয়ে যাওয়া হয়। 'সেখানে নতুন একটা শাড়ি পরিয়া, পানের রসে ঠোঁট রাঙা করিয়া, এবং গালে-

মুখে তেলের ছোপ লইয়া সেই মেয়েটা বারবার লাজে রাঙা হইয়া উঠিতেছে' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৩৪)। এরপর মোড়লের স্ত্রী কিশোরের হাতে ফুলের মালা দিয়ে সেটি তার স্ত্রীর গলায় পরানোর আহ্বান জানায়। মালা বদল শেষ হলে সে তাদের ঐ ঘরে রেখে বাইরে থেকে শিকল বদ্ধ করে। এসব লোকাচারের পরিণতিতে কিশোরকে জানানো হয়, 'শাস্ত্রমতে বিয়া কইর দেশে গিয়া' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৩৪)। পরদিন কিশোরের শাশুড়ি তাকে দেখতে আসে। এক্ষেত্রে প্রচলিত লোকসংস্কার হলো, দম্পতির মালা বদল হবার পর বিয়ের অনুষ্ঠান পূর্ণরূপে সম্পন্ন হবার আগ পর্যন্ত তারা দেখা করলে অমঙ্গল হয়। একারণে কিশোরের সঙ্গে তার স্ত্রীর মালা বদল হবার পরদিন তার শাশুড়ি বাঁশিরাম মোড়লের স্ত্রীকে নিষেধ করেছিল তাদের দেখা করাতে।

৪. লোকসাহিত্য

তিতাসপাড়ের মালোদের লোকসাহিত্যের সমৃদ্ধ ভান্ডার এ উপন্যাসের আদ্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে। বলাবাহুল্য, প্রাত্যহিক জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজনেই শুধু নয়, পাশাপাশি চিত্তবিনোদনের অংশ হিসেবেও লোকসাহিত্যের ভূমিকা অনস্বীকার্য। কেননা, মালোদের সংগ্রামশীল জীবনবাস্তবতা আর তাদের অনুসৃত লোকসংস্কৃতি– এ দুইয়ের সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত। লোকপুরাণ, প্রবাদ, ধাঁধা, রূপকথা, ছড়া এবং লোকসংগীতের অজস্র উল্লেখ তাদের বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যেও উপকরণ। প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্তসমূহ নিম্নরূপ–

৪.১ লোকপুরাণ

এ উপন্যাসে বিস্তৃত পরিসরে লোকপুরাণের বিভিন্ন প্রসঙ্গ বিবৃত। তিতাসপাড়ের গোকর্ণ গ্রামের সনাতন ধর্মাবলম্বী মালোদের প্রাত্যহিক জীবনে লোকপুরাণের প্রত্যক্ষ ও নেপথ্য উপস্থিতি লক্ষণীয়। নিছক ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিক শিক্ষালাভের উৎস হিসেবেই এর ভূমিকা মালোদের নিকট সীমাবদ্ধ নয়। বরং জীবিকা নির্বাহ, প্রাত্যহিক জীবনে পরস্পরের সঙ্গে ওঠাবসা-আলাপচারিতা, সংগীত-পূজা-পার্বণ, ব্রতকথা, পারস্পরিক সম্পর্কের বিন্যাস ও সম্ভাষণ, প্রকৃতিনির্ভর দিনযাপনে অর্জিত অভিজ্ঞতা, নর-নারীর আন্তঃসম্পর্ক অর্থাৎ তাদের সামষ্টিক জীবনপ্রবাহে এর অবারিত ও নিরঙ্কুশ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। প্রথাগত শাস্ত্রীয় রীতির পরিবর্তে লোকসমাজের একান্ত নিজস্ব ধর্মবোধ ও উপলব্ধি লোকপুরাণে অকৃত্রিমভাবে ফুটে ওঠে। কেননা, লোকমানুষেরা নিত্যদিনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা, প্রত্যাশা-প্রাপ্তির যে দোলাচলে বিচরণ করে, এর সঙ্গে লৌকিক দেবদেবীদের একাত্ম করতে বরাবর সচেষ্ট। এ উপন্যাসের 'প্রবাস খণ্ড' পরিচ্ছেদে লক্ষণীয়, শুকদেবপুর গ্রামে বাঁশিরাম মোড়লের বাড়িতে নিমন্ত্রিত হয়েছিল কিশোর, সুবল ও তিলকচাঁদ। বলিষ্ঠ, বয়স্ক ও সুদৃঢ় চেহারার মোড়লের পাশে তার তরুণী স্ত্রীকে দেখে কিশোর ভেবেছিল, সে যেন ছেলেবেলায় *রামায়ণ*, *মহাভারত*-এর গল্পে শোনা হনুমান, ভীম প্রমুখ বীরদের এতদিনে দেখছে। একপর্যায়ে তার ঘোমটাটানা স্ত্রীকে চকিতে দেখে কিশোরের মনে পড়ে ভৈরবকায় মহাদেবের পাশে উপবিষ্ট বালিকা-বধূ গৌরীর কথা। এভাবেই তার কল্পনায় শ্রুত লোকপুরাণ বাস্তবের পটভূমিতে মিলেমিশে একাকার হয়ে অন্তর্লোকে সৃষ্টি করে বিশ্বাস ও সমীহবোধ। দরিদ্রের সংসারে এলোমেলো, দীনভাব লক্ষ করে এক পর্যায়ে সে অকপটে মোড়লকে জানায়–'তোমার দিকে

চাইয়া আমার শিবঠাকুরের কথা মনে পড়ে। তোমার অত নামডাক, কিন্তু বাড়িঘরের ছিরি নাই। ... আমার মনে পড়ে যে শিবের কথা সে-শিব বুড়া। সকলের দরবারে তার নামডাক। কিন্তু ঘরে তার দৈন্য দশা।' ... শিশুর মত বাধিত হইয়া মোড়ল বলিল, 'তুমি আমারে শিব ঠাকুর বানাইলা। না জাল্লা, তুমি আমারে বুড়া শিব বানাইলা, আমার গৌরী বড় ভাল, তারে আবার নাচাইও না। আর আমরা ত শিবমন্ত্রী না, আমরা কিষ্ণমন্ত্রী' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪২৩)। 'নয়া বসত' পরিচ্ছেদে ভারতের বাড়িতে গ্রামের মোড়ল ও গণ্যমান্যদের উপস্থিতিতে গ্রামবাসী সমবেত হলে সেখানে জমিদারের খাজনা পরিশোধ নিয়ে দয়ালচাঁদের সঙ্গে বাদানুবাদ ঘটে কৃষ্ণচন্দ্র ও রামপ্রসাদের। দয়ালচাঁদকে কলহ থেকে বিরত রাখতে সেখানে উপস্থিত মাতবরদের একজন যে উদাহরণ দেয়, তাতে নিহিত রয়েছে *রামায়ণ*-এর অনুষঙ্গ—'দশের বৈঠকে লক্ষ্মণ-বর্জনের পালাখান তুমি কইর না বেপারী। ব্রজলীলার দিনে কুরুক্ষেত্তর ঘটাইয়া লাভ না।' ... 'কোন ত্রেতাযুগে কি কইরা রাখ্ছ অখন তারে ধুইয়া জল খাও' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৫২)। এ পরিচ্ছেদেই শ্যামসুন্দর বেপারীর বিয়ের বর্ণনা অনন্তের দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপিত। তার বালক মনস্তত্ত্বে এ অনুষ্ঠান পৌরাণিক ভাবাবহে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। শ্যামসুন্দরের মতো বয়স্ক পুরুষের সঙ্গে নিতান্তই এক বালিকার বিয়ে তার অন্তর্লোকে রূপকথায় বর্ণিত দৈত্য কর্তৃক রাজকন্যার বন্দি হবার কাহিনিকে মনে করিয়ে দেয়। পাশাপাশি বিয়ের অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তিতে নাপিত কর্তৃক পঠিত হয়। 'গুরুবচন' তার কাছে শিব-গৌরীর বিয়ের বৃত্তান্তকেই আবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। 'রামধনু' পরিচ্ছেদে বর্ষামুখর দিনের মেঘলা আকাশে আকস্মিকভাবে উদ্ভাসিত রামধনু দেখে বনমালীর স্মৃতিচারণায় ভেসে ওঠে বোন উদয়তারার শৈশবস্মৃতি। বনমালীর চেতনালোকে রাম-সীতার পৌরাণিক প্রসঙ্গ জেগে ওঠে তার কথা ভেবে। কেননা, বহুদিন হয়ে গেছে, নাইয়রে সে বনমালীর কাছে আসেনি। বনমালী শ্রুত 'সীতার বনবাস' পালায় এর যে লৌকিক ভাষ্যরূপ বিবৃত, সেখানে দশমাথা কুড়ি হাতের রাক্ষস রাবণকেও রামের ধনু হাতে তুলে নিতে মুখে রক্ত ওঠাবার মতো কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। শেষ পর্যন্ত রাম সেটি হাতে তুলে নেয়। 'হরধনু না কি বলিয়াছিল— তাই রামের হাতের ধনু। কিন্তু সীতা সে ধনু রোজই বাঁ হাতে তুলিয়া লইয়া ডানহাতে তলাকার জায়গাটুকু লেপিয়া পুছিয়া শুদ্ধ করিয়া দিত। তারপর সীতার বিবাহ হইয়া গেল। রাম তাকে নিয়া অযোধ্যাতে আসিল। তারপর সীতা আর বাপের বাড়ি আসে না' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৮৮)। লোকপুরাণাশ্রিত পালায় সীতার সঙ্গে উদয়তারার ভাবসাদৃশ্যে এভাবে বনমালীর চেতনালোকে বাস্তবের সমান্তরালে পৌরাণিক জগতের ভাবসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। তাই সে উদয়তারাকে দেখতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এভাবেই তার ভাবনায় লোকপুরাণ বাস্তব আর কল্পনার যোগসাজসে নতুন মাত্রায় উন্নীত হয়। এ পরিচ্ছেদেই উদয়তারার আচরণে অনন্ত যেন প্রত্যক্ষ করে লোকপুরাণের কোনো শক্তিময়ী দেবীকে, যার কথা সে মায়ের কাছে গল্পে শুনেছিল। উদয়তারা যখন প্রবল ঝড়কে প্রতিহত করতে বজ্রকণ্ঠে হুঙ্কার ছাড়ে, অনন্ত তার উচ্চারিত সংলাপ শুনে সমীহ প্রকাশে বাধ্য হয়— 'দোহাই রামের দোহাই লক্ষ্মণের, দোহাই বাণ রাজার; দোহাই ত্রিশ কোটি দেবতার' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৯৫)। আবার, অনন্তকে আশ্রয় দিতে গিয়ে বাবা-মার কাছে অপমানিত বাসন্তী ক্ষিপ্ত হয়ে যে ভাষায় তাকে অভিশাপ দেয়, এতেও লোকপুরাণের অশুভ-অকল্যাণের প্রতীক হিসেবে যম, ডাকিনী, যোগিনী ও কালীর প্রতি আহ্বান ঘোষিত। বাসন্তীর আশ্রয় হারিয়ে উদয়তারার কাছ থেকে অনন্ত মায়ের স্নেহ পেয়েছিল। সেই নারীর অন্তর্লোকে সঞ্চিত লৌকিক ধর্মভাবনা ও দেবদেবী-অবতারের প্রসঙ্গ অনন্তের সরল-অপরিণত মনে অব্যাখ্যেয়

নানা ভাবনার জন্ম দেয়। বিশ্বলোক, গ্রহ-নক্ষত্র, চাঁদ-সূর্য সম্পর্কে লোকসমাজের বাসিন্দাদের বৈজ্ঞানিক ধারণা না থাকলেও তারা পূর্বপুরুষদের নিকট থেকে প্রাপ্ত ধারণা, লোককাহিনি, লোকপুরাণ ও কিংবদন্তিতে উপজীব্য বৃত্তান্তের আলোকে এর নিজস্ব ব্যাখ্যা দাঁড় করায়। এর পেছনেও একধরনের যুক্তি কার্যকর। হয়তো তা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত সত্য নয়, কিন্তু লোকসমাজের বাসিন্দাদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পাবার জন্য কল্পনা আর বাস্তব মিলিয়েই তারা নিজেদের মতো করে বিশেষ ধারণা তৈরি ও যুগযুগ ধরে তা লালন করে চলে। অনন্ত উদয়তারার কাছ থেকে শোনে, আকাশে যে তারাগুলো বিদ্যমান, সেগুলো তোলা মানুষের পক্ষে কখনো সম্ভব নয়। স্বর্গে দেবতারা থাকে, তারাই আকাশে তারা ছিটিয়ে দিয়েছে– প্রচলিত এ লোকবিশ্বাস সম্পর্কে অনন্তের মনে সন্দেহ জাগলে সে এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হতে চায় উদয়তারার কাছে– 'স্বর্গে যে দেবতারা থাকে। রাম, লক্ষ্মণ, কৃষ্ণ, দুর্গা, কালী, শিবঠাকুর, তারাও কি তুলিতে পারে না! ... তারা ইচ্ছা করিলে তুলিতে পারে, কিন্তু তোলে না। তারাই ছিটাইয়া দিয়াছে, তারাই তুলিবে? রোজ রাতে ছিটাইয়া দিয়া তারা মানুষেরে ডাকিয়া বলিয়া দেয়, দিলাম ছিটাইয়া যদি কেউ পার তুলিয়া নাও। কিন্তু তুলিবার লোক নাই। এখন দেবতার পূজা হইবে কি দিয়া! শেষে তারা মাটিতে নকল ফুল ফুটাইয়া দিল। সে-ফুল রোজ ফুটে, লোকে রোজ তুলিয়া নিয়া পূজা করে। যে-সব ফুল তোলা হয় না, তারা ঝরিয়া পড়িয়া যায়। বাসি হইয়া থাকে না। বাসি ফুলে পূজা হইতে পারে না' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৫০৪)। উদয়তারা জানায়, সাধারণ মানুষের পক্ষে দেবতাদের আহ্বান বোঝা সম্ভব নয়। শুধু সাধু-মহাজনরাই তা বুঝতে পারে। তারা পূজা-অর্চনা, তপস্যা-ধ্যানের মধ্য দিয়ে দেবতাদের সঙ্গে আলাপ করে। ধর্ম সম্পর্কে এ ধরনের লৌকিক বিশ্বাস ও সংস্কারের মূলেও রয়েছে বহুকাল ধরে প্রচলিত লোকপুরাণের প্রভাব। সেকারণে উদয়তারার আলাপে *মনসাপুরাণ*-এর বেহুলা লখিন্দরের বৃত্তান্ত গুরুত্ব পায়। তবে স্মর্তব্য, শাস্ত্রীয় পুরাণের ক্রমবিবর্তিত রূপটিই কালিক প্রবাহে রূপান্তরিত হয়ে লোকসমাজে গৃহীত হয়। এতে লোকমানুষের চিন্তা-চেতনা, ভাবনা, বিশ্বাস ও কল্পনা সংযোজিত হয়, আবার বাহুল্য বিবেচনায় নানা প্রসঙ্গ ও ঘটনা কখনো পরিবর্জিত, কখনো পরিবর্তিত রূপে মূল পুরাণের সঙ্গে যুক্ত থাকে। সেকারণেই উদয়তারার বয়ানে এ কাহিনিতে বেহুলার নাম 'ভেলইয়া', লখিন্দর সম্বোধিত হয় 'লখাই পণ্ডিত'। অনুধাবন করা চলে, বহুযুগ ধরে লোকসমাজে এসব পুরাণ প্রচলিত হতে হতে সময়ের বিবর্তনে বিশেষ লৌকিক আবহ, মেজাজ ও ভঙ্গিকে আয়ত্ত করেছে। উদয়তারার কাছ থেকে অনন্ত শোনে মৃত লখাইকে প্রাণ বাজি নিয়ে স্বর্গে গিয়ে ভেলইয়ার দেবতাদের তুষ্ট করে প্রাণ ফিরিয়ে দেবার দুঃসাহসী অভিযানের কথা। শুধু তাই নয়, স্বর্গে বেহুলার যাত্রার পাশাপাশি উদয়তারা অনন্তকে, হিমালয় পর্বত বা 'হিমাইল রাজা'র লোকপুরাণ শোনায়, যেখান থেকে হেঁটে যুধিষ্ঠির স্বর্গে তথা দেবতাদের আবাসস্থলে যায়। অনন্তের বালক মনেও কল্পনা জেগে ওঠে। সে বড়ো হয়ে হেঁটে হেঁটে তিতাসের তীর ধরে হিমাইল রাজার দেশ থেকে স্বর্গে যাবার ইচ্ছা পোষণ করে। সময়ের আবর্তনে পরিণত বয়সে বিদ্যার্জনের জন্য গ্রাম ছেড়ে তার শহরে যাত্রার প্রচেষ্টায় যে পরিবর্তিত জীবনের প্রতি আসক্তি ও সচেতন আগ্রহ, তা বিবেচনায় রাখলে বলা চলে, সে-ও গ্রামীণ জীবন ছেড়ে শহুরে বাবু সংস্কৃতির ধারক-বাহক তথা মালোদের সঙ্গে প্রতিতুলনায় দেবতাসুলভ খ্যাতি ও মর্যাদার অধিকারী হয়ে ওঠে। ফলে গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে তার সামাজিক পরিচয় ও মানসিকতাগত দূরত্ব সৃষ্টি হয়। কৃষ্ণ-যশোদার পৌরাণিক বৃত্তান্তও এ উপন্যাসে লক্ষণীয়। উদয়তারার বাপের বাড়িতে এসে সে পরিচিত হয় জনৈক বৈষ্ণব সাধুর সঙ্গে। সাধুর বয়ানে ফুটে ওঠে

বালগোপাল কৃষ্ণের নির্মল, স্নিগ্ধ অভিব্যক্তির সঙ্গে অনন্তের সাদৃশ্য কল্পনাযোগে পৌরাণিককালের যশোদাজননীর সঙ্গে অম্ল-মধুর সম্পর্কের মানবিক আখ্যান। আবার অনন্তের মায়ের সঙ্গে কিশোরের এবং অনন্তের সঙ্গে অনন্তবালার আন্তঃসম্পর্কের বিভিন্ন পর্যায়েও অবলম্বিত হয়েছে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমকাহিনি। এ উপন্যাসে বিস্তৃত পরিসরে *মনসামঙ্গল*-এর পুরাণ মালোদের প্রাত্যহিক জীবনে বিশিষ্ট পরিচয়ে উদ্ভাসিত। বলাবাহুল্য, শাস্ত্রীয় ধর্মাচার ও পূজার রীতি, পুরাণ পাঠের আদর্শের সঙ্গে মালোদের নিজস্ব ধর্মীয় রীতিনীতি-সংস্কার মিলেমিশে এতে সৃষ্টি হয়েছে স্বতন্ত্র লৌকিক পরিমণ্ডল। শ্রাবণ মাসে *পদ্মাপুরাণ* পাঠ শেষে বেহুলার প্রসঙ্গকে স্মরণে রেখে জালাবিয়ার আয়োজন করা হয়। এর সঙ্গে যুক্ত হয় সেই লোকপুরাণের আখ্যানকে গল্পের আকারে জনসমাজে পরিবেশনের বৃত্তান্ত। 'শ্রাবণের শেষদিন পর্যন্ত পদ্মাপুরাণ পড়া হয়, কিন্তু পুথি সমাপ্ত হয় না। লখিন্দরের পুনর্মিলন ও মনসা-বন্দনা বলিয়া শেষ দুটি পরিচ্ছেদ রাখিয়া দেওয়া হয় এবং তাহা পড়া হয় মনসা পূজার পরের দিন সকালে, সেদিন মালোরা জাল বাহিতে যায় না। খুব করিয়া পদ্মাপুরাণ গায় আর বোল করতাল বাজায়। 'দুরঙা প্রজাপতি' পরিচ্ছেদে অনন্তের বিদ্যার্জনের যে বৃত্তান্ত রূপায়িত, এর সঙ্গে লোকপুরাণের সংযোগ রয়েছে। সে অল্প স্বল্প পড়তে জানলেও নিয়মিত বিদ্যালয়ে গিয়ে পড়ালেখার সুযোগ তার ছিল না। তার মুখে *রামায়ণ* পাঠ শুনে গ্রামের নাপিতানী তাকে উদ্বুদ্ধ করে কুমিল্লা শহরে গিয়ে বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে শিক্ষিত হতে। মালোদের লোকসংগীতেও লোকপুরাণের বিভিন্ন প্রসঙ্গ বিবৃত হয়েছে। তারা বংশপরম্পরায় এসব গানের চর্চা অব্যাহত রাখে। মোহন ও বাসন্তী মালোদের নিজস্ব সংস্কৃতি টিকিয়ে রাখতে লোকসংগীতের দ্বারস্থ হয়েছিল। রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়কথায় নর-নারীর সম্পর্কে বিদ্যমান আবেগানুভব, প্রেম-বিরহকাতরতা এসব গানের মধ্য দিয়ে লোকপুরাণের ভাবপরিমণ্ডলকেই মালোদের সমষ্টিচেতনায় ফিরিয়ে আনে। এর সঙ্গে যুক্ত লৌকিক দর্শনের সংযোগও মালোদের ভাবনায় বিশেষ আবেদন সঞ্চার করে—

> কানাইরে বেলা হইল দুই রে প'র। প্রাণটি কাঁপে রাধার থর থর রে, মথুরায় বিকি যায় রে বইয়া রে সুন্দর কানাইরে।' এই রাধা বৃন্দাবনের প্রেমাভিসারিকা রাধা নহে। এ রাধা জন্ম-মৃত্যু দুই তীরের পারাপারশীল মানব আত্মা। কংসনদী অর্থাৎ যমুনা নদী এখানে জন্মমৃত্যুর সীমারেখা। আত্মা তার খেলাঘর ছাড়িয়া উজান ঠেলিয়া চলিয়াছে। ... কানাইবেশী ভূমাই তাহাকে পার করিয়া চালাইয়া নিবার মালিক, আত্মা নিষ্কলুষ হইলে কি হইবে, তার পার্থিব দধিভাণ্ডের প্রতি মায়া জাগে। কিন্তু নারায়ণ তাকে ঐহিক সবকিছুর কলঙ্ক-স্পর্শ থেকে নির্মুক্ত করিয়া, পরিশুদ্ধ করিয়া লইকে চান, নিজের মধ্যে গ্রহণ করিবার পূর্বে এই জন্যে তিনি দধিরভাণ্ড স্পর্শ করিয়া সব দধি নষ্ট করিয়া দিয়াছেন। সকল মালো এই সব অর্থ না বুঝিলেও, গানের সুরে সুদূরের কি কথা যেন ভাসিয়া আসিয়া তাদের জীবনে এক জীবনাতীতের বাণী শুনাইয়া গেল। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৫৪৮)

৪.২ লোককথা ও রূপকথার অনুষঙ্গ

> মাইয়া লোকে করতাল বাজাইয়া যা নাচে। নাচে ত না, যেন পরীর মত নিত্য করে। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪২৮)

> ছেলেটা ঘরের এক কোণে মলাটের বাক্সে তার রূপকথার রাজা সাজাইতেছে। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৪১)

> একটি নেংটি ইঁদুর বুঝি ধানক্ষেতের প্যাঁচ হইতে বাহির হইয়া রূপকথার দেশে দেশে এক নদীর পারে গিয়া দেখিল সামনে রূপার নদী। গলানো উপছানো রূপার নদী। সে তো নদী

নয়, হাজার বছরের না-শোনা গল্প দুই তীরের বাঁধনে পড়িয়া একদিকে বহিয়া চলিয়াছে। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৪২)

অনন্ত উহাদের মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। এরা বুঝি রূপকথার দেশের। এদের মনে মনে অনেক গল্প জমা আছে, বলিলে কোনোদিন ফুরাইবে না। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৪৭)

রামপ্রসাদ ... নদীর দিকে চলিল। তার চোখে আজ রোদের সোনা মিশিয়া চারদিক সোনাময় হইয়া গিয়াছে। আজ এরা যেন সব সোনার শিশু। সোনার খেলনা হাঁড়িকুড়ি লইয়া রূপার বালিতে ভাত চাপাইয়া চাঁদ সুরুজের দেশে নিমন্ত্রণ পাঠাইয়াছে। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৫৯)

সেই ঈশ্বর মালো আর ইচ্ছারাম মালো নামে রূপকথার মানুষ দুইটা। পাহাড় পর্বত ভাঙ্গিয়া, খালবিল ডিঙ্গাইয়া, কত দেশদেশান্তরের বুক চিরিয়া তারা যেন এক বোঝাই গল্প লইয়া আসিয়াছে। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৫২৭)

সামনে যে টোপর মাথায় চুপ করিয়া বসিয়া আছে, সে বিরাট এক দৈত্য। ছোট মেয়েটাকে তার দলের লোকেরা ধরিয়া আনিয়া তার গুহার মধ্যে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে। মেয়েটা চাহিয়া দেখে চারিদিকে লোকজন, পালাইবার চেষ্টা করিয়া কোন ফল হইবে না। তার চেয়ে এই ভাল। আপাতত দৈত্যকে ঘুরিয়া প্রদক্ষিণ করিতে করিতে তার মাথায় ফুল ছড়াইয়া তাকে তুষ্ট রাখা চলুক। তার লোকজন অন্যমনস্ক হইলে যেই একটু ফাঁক পাওয়া যাইবে অমনি মেয়েটি এখান হইতে পলাইয়া যাইবে। কোথায় যাইবে? যেখানে তার জন্য খেলার সাথীরা প্রতীক্ষা করিয়া আছে। পালাইয়া অনন্তদের বাড়িতে গিয়া উঠিলে মন্দ হয় না। মা তাকে কিছুদিন লুকাইয়া রাখিবে। দৈত্যটা তাকে পাড়াময় বৃথাই খুঁজিয়া মারিবে। পাইবে না। অবশেষে একদিন তিতাসের জলে ডুবিয়া মরিবে। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৬৪)

এ উপন্যাসে মালোসমাজে প্রচলিত বিভিন্ন রূপকথা ও লোককথার অনুষঙ্গের উল্লেখ লক্ষণীয়। কখনো কখনো লেখকের দৃষ্টিকোণ থেকে উপন্যাসের বর্ণনায় এসব প্রসঙ্গ এলেও প্রধানত বালক অনন্তের শিশুসুলভ কল্পনা ও বিস্ময় পারিপার্শ্বিক জীবন-জগতের বিভিন্ন বস্তু ও ঘটনার আদলে রূপকথার সঙ্গে সাদৃশ্যধর্মী বিবেচিত হয়েছে এসব দৃষ্টান্তে। শ্যামসুন্দর ব্যাপারীর বিয়ের দৃশ্য বর্ণনায় রূপকথায় শ্রুত দৈত্য ও বন্দি রাজকন্যার কাহিনির ভাবসাদৃশ্য কল্পনা এর প্রমাণ। সর্বশেষ উদ্ধৃতিতে বালক রমুর মনোলোকে গল্পকথার বিচিত্র ভুবনের প্রতি অনন্তের বিস্ময়সূচক ভাবনা নৌকা গড়ানোর কাজে আগত দুজন মালোর উপস্থিতিসূত্রে ভাষ্যরূপ পেয়েছে।

৪.৩ প্রবাদ

আ-ঘাটাতে ঘাট হয়, আ-পথে পথ হয়, আ-কুটুমে কুটুম হয়। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৪২)

জোয়ারে বাড়ে ভাটায় কমে, জলের আবার একটা বিশ্বাস। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৫৭)

গরিবের হাতে টাকা পড়িলে উড়িবার জন্য ছটফট করে। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৬৯)

মানুষের কুটুম আসা-যাওয়ায় আর গরুর কুটুম লেহনে-পুছনে। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৭০)

যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৮৩)

তেলে জলে ... মিশে না (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৮৫)

লোকে কয়, মা মরলে বাপ তালই, ভাই বনের পশু। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৮৭)

কাজের ভাসসি নাই, খাওনের গোঁসাই। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৫১৪)

মানুষে কয়, মা নাই যার, ছার কপাল তার। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৫১৬)

তীর্থের মধ্যে কাশী ইষ্টির মধ্যে মাসী, ধানের মধ্যে খামা কুটুমের মধ্যে মামা। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৫১৬)

৪.৪ ধাঁধা

পান খাও রসিক জমাই কথা কও ঠারে, পানের জন্ম অইল কোন অবতারে। যদি না কইতে পারে পানের জন্ম কথা, ছাগল হইয়া খাও শ্যাওড়াগাছের পাতা। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৪৬)

সু-ফুল ছিট্যা রইছে তুলবার লোক নাই: সু-শয্যা পইড়া রইছে, শুইবার লোক নাই (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৫০৪)

হিজল গাছে বিজল ধরে, সন্ধ্যা হইলে ভাইঙ্গা পড়ে (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৫০৮)

পানির তলে বিন্দাজী গাছ ঝিকিমিকি করে, ইলসা মাছে ঠোকর দিলে ঝরঝরাইয়া পড়ে (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৫০৮)

আদা চাচচাক দুধের বর্ণ, এ শিলোক না ভাঙ্গাইলে বৃথা জন্ম। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৫০৯)

৪.৫ ছড়া

বুড়ি ছড়া কাটে– 'কাউয়ার দাদা মরল, কুলা দিয়া ঢাকল, দূর হ কাউয়া দূর!' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৪৭)

জিভে কামড় শিরে হাত কেমনে আইল জগন্নাথ? (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৪৮)

আমার দিদি কাটুনি সুতা কাটতে পারে। একনাল সূতায় হস্তী বান্ধা পড়ে। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৪৯)

কি গ বিন্দাবনের নারী, কোন কালোচোরা লড়দা গেছে মাইরা বাঁশের বাড়ি। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৭০)

রামের হাতের ধেনু, লক্ষ্মণের হাতের ছিলা, যেইখানের ধনু সেইখানে গিয়া মিলা। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৮৮)

আয়, লাভে রে লাভে রে লাভে রে লাভে, আরে লাভে! আয়, দুয়ে রে দুয়ে রে দুয়ে, আরে দুয়ে! আয়, তিনে রে তিনে রে তিনে, আরে তিনে– (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৯০)

অনন্তবালা, সোনার মালা, যখনই পরি তখনি ভালা। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৫১৮)

দম্ব দম্ব তাই তাই, ঠাকুর লইয়া পূবে যাই। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৫২০)

অনন্তবালা ঘরের পালা, তারে নিয়া বিষম জ্বালা। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৫৫৪)

জিলাপির পেঁচে পেঁচে রসভরা, মণ্ডা কি ঠাণ্ডা লাগে জল ছাড়া। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৫৫৬)

যদি থাকে বন্ধুর মন, গাঙ পার হইতে কতক্ষণ (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৫৫৬)

৪.৬ লোকসংগীত

এ উপন্যাসে বিভিন্ন ধরনের লোকসংগীতের[৩] উল্লেখ থেকে মালোদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের স্বকীয়তা অনুধাবন করা যায়। তাদের প্রাত্যহিক জীবনের আলাপে, বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে, এমনকি উৎসবেও লোকসংগীতের জোরালো উপস্থিতি লক্ষণীয়। শুধু

মালোদের সাংস্কৃতিক বলয়ভুক্ত সংগীতই নয়, পাশাপাশি তাদের প্রতিবেশী মুসলমান কৃষকদের মধ্যে প্রচলিত জারি-সারি গানের উল্লেখও এ উপন্যাসে লক্ষণীয়। বিভিন্ন ধরনের লোকসংগীতের মধ্যে রয়েছে দেশাত্মবোধক গান, কবিগান, জারি ও সারি গান, ব্রতের গান, ভাটিয়ালি, রাধা-কৃষ্ণের প্রেমবিষয়ক সংগীত, মুর্শিদি-বাউল গান, বারোমাসি গান, পুথির গান, নৌকাবাইচের গান প্রভৃতি। এসব গানে মালোদের গোষ্ঠীচেতনা এবং নিজস্ব সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়েছে 'দুরঙা প্রজাপতি' পরিচ্ছেদে, যেখানে শহুরে জাঁকজমক ও আড়ম্বরপূর্ণ যাত্রা তথা বহিরাগত সংস্কৃতির আধিপত্যে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি বিলীন হবার নির্মম বাস্তবতা দিনদিন প্রকটিত হয়। বিশেষত বাসন্তী এবং মোহন এসব ঐতিহ্যবাহী পরিবেশনের মাধ্যমে নিজেদের গোষ্ঠীগত স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় মরিয়া ছিল। তাই তারা এসব সংগীতকে আঁকড়ে ধরে যাত্রাকে প্রতিহত করতে উদ্যোগী হয়েছিল, যদিও তা শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি। কেননা, সস্তা-লঘু বিনোদনের পাশাপাশি চোখ ঝলসানো আড়ম্বরপূর্ণ আয়োজন ও বাদ্যযন্ত্রের প্রলুব্ধকর আহ্বানে সাড়া দিয়ে মালোপাড়ার অধিকাংশ নরনারী নিজেদের সংস্কৃতি তথা লোকসংগীতের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিল। মূলত এ ঘটনার পরিণতিতে তাদের সাংস্কৃতিক পরাভব প্রবল হয়ে ওঠে। এ উপন্যাসে বিধৃত কিছু উল্লেখযোগ্য লোকসংগীতের দৃষ্টান্ত–

৪.৬.১ ব্রতের গান

'নারীরা গীত গাহিতেছে; 'সখী ঐ ত ফুলের পালঙ রইলো, কই কাঁলাচাঁদ আইলো।' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪১৪)

৪.৬.২ ভাটিয়ালি গান

উত্তরের জমিনেরে সোনা-বন্ধু হাল চষে,
লাঙ্গলে বাজিয়া উঠে ধুয়া।
দক্ষিণা মলয়ার বায় চান্দমুখ শুখাইয়া যায়
কার ঠাঁই পাঠাইব পান গুয়া। ...
নদীর কিনার দিয়া গেল বাঁশি বাজাইয়া,
পরার পিরীতি মধু লাগে।
কু-খেনে বাড়াইলাম পা' খেয়াঘাটে নাইরে না,
খেয়ানীরে খাইল লঙ্কার বাঘে। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪১৮)

৪.৬.৩ নৌকাবাইচের গান

অকাঠ মান্দাইলের নাও, ঝুনুর ঝুনুর করে নাও, জিত্যা আইলাম রে নাওয়ের গলুই পাইলাম না। ...

তারে ডাক দে, দলানের বাইর হইয়া গেল, অ দিদি, প্রাণ বন্ধুরে তোরা ডাক দে।।

আমার বন্ধু খাইবে ভাত, কিন্যা আনলাম ঝাগুর মাছ গো, অ দিদি, দুধের লাগি পাঠাইয়াছি, পয়সা কি সুকি কি টেকা গো, অ দিদি প্রাণবন্ধুরে তোরা ডাক দে।।

আমার বন্ধু ঢাকা যায়, গাঙ্ পারে রান্ধিয়া খায় গো, অ দিদি, জোয়ারে ভাসাইয়া নিল হাঁড়ি, কি ঘটি, কি বাটি গো, অ দিদি প্রাণবন্ধুরে তোরা ডাক দে।। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৫৩৪)

৪.৬.৪ বারমাসি গান

হায় হায়রে, এহিত চৈত্রি না মাসে গিরস্তে বুনে বীজ। আন গো কটোরা ভরি খাইয়া মরি বিষ। বিষ খাইয়া মইরা যামু কানবে বাম মায়। আর ত না দিবে বিয়া পরবাসীর ঠাঁই। ...

আসিল আষাঢ় মাস হায় হায়রে, এহিত আষাঢ় মাসে গাঙে নয়া পানি। যেহ সাধু পাছে গেছে সেহ আইল আগে। হাম নারীর সাধু খাইছে লঙ্কার বাঘে। ...

হায় হায়রে, এহিত পৌষ না মাসে পুষ্প অন্ধকারী। এমন সাধের যৈবন রাখিতে না পারি। কে চায় রে আড়ে আড়ে কেহ চায় রে রইয়া। কতকাল রাখিব যৈবন লোকের বৈরী হইয়া। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৫২১)

৪.৬.৫ বাউল গান

এলাহি দরিয়ার মাঝে নিরঞ্জনের খেলা,
শিল পাথর ভাসিয়া গেল শুক্‌নায় ডুবল ভেলা।
জলের আসন বসন দেইখ্যা সারাসারি,
বালুচরে নাও ঠেকাইয়া পলাইল বেপারী। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৩৮)

৪.৬.৬ পুথি পাঠ

হাম্মক রাজার দেশেরে–
উত্তরিল শেষে রে। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৩৮)

৪.৬.৭ কেচ্ছার গান

আর দিন উঠেরে চন্দ্র পূবে আর পশ্চিমে।
আজোকা উঠ্‌ছেরে চন্দ্র শানের বান্ধান ঘাটে। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৩৮)

৪.৬.৮ যাত্রাগান

চুপ চুপ চুপ লাজে সরে যারে, ধীরে ধীরে চল, সজনী লো। ধূলা দিয়ে সখী আমাদের চোখে গোপনে প্রণয় রেখেছে ঢেকে, এবার ভোমর যাবে লো ছুটে, চল, না যেতে যামিনী লো (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৫৪৯)

৫. লোকপ্রথা

সামাজিক বিভিন্ন রীতিনীতি-প্রথা ও মূল্যবোধ মান্য করার শর্ত লোকমানুষের আন্তঃসম্পর্কে ক্রিয়াশীল। এ উপন্যাসে অনুরূপ দৃষ্টান্ত লক্ষণীয়। নাইয়র প্রথা, অপরিচিত কারো সঙ্গে সখিত্ব ও বন্ধুত্ব পাতানো, এমনকি গোষ্ঠীভুক্ত সদস্যদের পালিত অনুশাসন ও সামাজিক বিধান এর অন্তর্গত। এ উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদেই নাইয়র প্রথার উল্লেখ লক্ষণীয়। এটি 'বিয়ে'-কেন্দ্রিক লোকপ্রথার দৃষ্টান্ত, যা হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে উভয় সম্প্রদায়ই পালন করে। বিয়ের পর বিবাহিত নারীরা যখন নৌকায় চড়ে বাপের বাড়ি থেকে স্বামীর বাড়ি যায়, তখন নৌকার ছইয়ে

থাকে কাপড়ের বেড়া। যেন পরপুরুষেরা তাকে দেখতে না পারে, সেকারণেই এ রীতি প্রচলিত। তাকে মাথায় ঘোমটা টেনে অন্যের দৃষ্টি থেকে আড়ালে নিজেকে রাখতে হয়। সঙ্গে স্বামী থাকায় তার নির্দেশ মেনে চলার বাধ্যবাধকতাবশত স্বাধীনভাবে বেড়ানোর আনন্দ থেকে সে অনেকটাই বঞ্চিত হয়। 'তারা স্বামীর বাড়ি থেকে বাপের বাড়ি আর বাপের বাড়ি থেকে স্বামীর বাড়ি যায় অনেক হাসি-কান্নার ঢেউ বুকে লইয়া। যে বউ স্বামীর বাড়ি যায়, তার এক চোখে প্রজাপতি নাচে, আরেক চোখে থাকে জল' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪০৩)। তাছাড়া নিজের বাপ মা ভাই বোনকে ছেড়ে আসার বেদনায় তার মন বেদনায় ভারাতুর থাকে। কেননা, শ্বশুরবাড়িতে স্বামী, দেবর, ননদ, শ্বশুর, শাশুড়ি ও অন্য স্বজনদের মন বুঝে তাকে চলতে হয়, বিয়ের পর ধীরে ধীরে সেই অপরিচিত সংসারে নিজেকে মানিয়ে নিতে হয়। আবার শ্বশুরবাড়ি থেকে গৃহবধূ যখন বাপের বাড়িতে যায়, তখন তার নৌকায় বেড়া থাকে না। এমনকি মাথায় ঘোমটা টানার প্রয়োজনও ফুরায়। স্বামীর বাড়ির ঘাট দৃষ্টির আড়ালে গেলে তবেই সে স্বাধীনভাবে নৌকায় চড়ে বেড়াবার আনন্দ উপভোগ করে। সে মনের আনন্দে যাত্রাপথের দৃশ্যরাজি উপভোগ করতে করতে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে। বিয়ের পরিণতিতে নিজের বাড়ি ছেড়ে আসার যে বেদনা, এর অনেকটাই ঘুচে যায় নাইওরে বাপের বাড়ি এলে। আবার পথে যেতে যেতে অচেনা কোনো নারীকে দেখে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করা বা সখী সম্পর্ক পাতানোর রীতিও লোকসমাজে প্রচলিত। বিরামপুর গ্রামের সম্পন্ন গৃহস্থ ও পেশায় কৃষক কাদির মিয়ার একমাত্র মেয়ে জমিলা নাইওরে স্বামীর বাড়ি আসার সময় হঠাৎ করেই আমিনপুর গ্রামের বনমালীর বোন উদয়তারাকে দেখে তার সঙ্গে এ ধরনের সম্পর্ক পাতানোর ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠেছিল। 'বড় ভাল লাগিয়াছে তার মানুষটাকে। প্রথম দৃষ্টিতে সে তাকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে, সেও কি তেমনি ভালবাসে নাই? কেমন অনুরাগের ভরে চাহিয়াছিল। ... আবার যখন বাপের বাড়ি যাইব, বাপকে বলিয়া রাখিব, এই রকম ওই মেয়েটি দেখিতে ঠিক আমার মত; তার বাপকে বলিয়া দেখিও, আমার মেয়ে তোমার মেয়ের সঙ্গে সই পাতিতে চায়, তুমি রাজি আছ কিনা' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪০৪)। 'দুরঙা প্রজাপতি' পরিচ্ছেদে উদয়তারা বনমালী ও অনন্ত জমিলাদের বাড়িতে আসে। তখন জমিলা উদয়তারাকে এ বৃত্তান্ত জানায়। একথা শুনে 'উদয়তারা শুধু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। তার জমিলা নামটা খুব ভাল লাগিল। কিন্তু সে সংসারের সম্বন্ধে এত অনভিজ্ঞ দেখিয়া বেদনা বোধ করিল' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৫৪১)। প্রকৃতপক্ষে, কিছুটা অপরিণতমনস্ক হলেও জমিলার এ আকুতি অসাম্প্রদায়িক ও উদারভাবাপন্ন মানবধর্মের অন্তরঙ্গ আহ্বানকেই ধ্বনিত করে। অনুরূপ দৃষ্টান্ত লক্ষণীয় 'প্রবাস খণ্ড' পরিচ্ছেদে। শুকদেবপুর গ্রামে আসার পর জনৈক ব্যক্তি কিশোরের সঙ্গে কুটুম্বিতার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু সে ইতোমধ্যেই তার সম্ভাব্য স্ত্রী এবং পরবর্তীকালে সন্তানের জননী তথা অনন্তের মার প্রেমে বিমুগ্ধ ছিল। তাই জনৈক ব্যক্তির প্রস্তাবকে সে সেই নারীর প্রেমাকুতি সম্পৃক্ত ভেবে এ প্রস্তাবে প্রথমে সাড়া দিতে চেয়েছিল। কিন্তু যখন তার ভুল ভাঙে, সে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার পাশাপাশি তার বন্ধু সুবলের সঙ্গে সেই ব্যক্তিকে বাদ্য-বাজনা বাজিয়ে নতুন সাজপোশাক পরিয়ে কাপড় গামছা বদল করে 'বন্ধুস্তি'-র আহ্বান জানায়। পরিবারে প্রচলিত প্রথা, রীতির দৃষ্টান্তও এ উপন্যাসে লক্ষণীয়। কালোবরণের পরিবার গোকর্ণঘাট গ্রামের সবচেয়ে সমৃদ্ধ পরিবার। আর্থিক সঙ্গতিগুণে কালোবরণ ও তার ভাইয়েরা সকলের কাছে সমীহের পাত্র হিসেবে বিবেচিত। কালোবরণের বিধবা মা সংসারের কর্ত্রী। সংসারের যে কোনো ব্যাপারে তার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। তার নির্দেশ অমান্য করার সাধ্য তার তিন ছেলে ও তাদের স্ত্রীদের নেই। দাপুটে, ব্যক্তিত্বময়ী নারী হিসেবে তার মুখের কথাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসেবে পরিবারে প্রচলিত। ছেলেরা ভোরে মাছ

ধরতে বেরিয়ে গেলে তাদের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম জোগাড় করে সঙ্গে দেওয়ার জন্য তাদের স্ত্রীদেরও ঘুম থেকে উঠতে হয়। এরপর গ্রামের অন্য সব নারীর আগে নদীতে গিয়ে তাদের স্নান করে আসতে হয়। তাদের পক্ষে কালোবরণের মায়ের এ নির্দেশ অমান্য করার সুযোগ নেই। সামাজিক প্রথার অংশ হিসেবে মালোদের সবচেয়ে জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান বিয়ে সম্পর্কে দুটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। মালোদের বিয়েতে যৌতুক প্রথা শুধু প্রচলিতই নয়, এর অনুসরণ রীতিমতো বাধ্যতামূলক ব্যাপার। এক্ষেত্রে কনেপক্ষকে বরপক্ষের যৌতুক দিতে হয়। বনমালী তার তিন বোন নয়নতারা, উদয়তারা ও আসমানতারার বিয়েতে তিনশত টাকা করে যৌতুক নিয়েছিল বরপক্ষের কাছ থেকে। কিন্তু নিজের আর্থিক সঙ্গতি না থাকায় তার মাথায় শোলার মুকুট ওঠেনি। এজন্য উদয়তারার অনুতাপের অন্ত ছিল না। আবার, বিয়ের পর নতুন জামাই শ্বশুরবাড়িতে এলে গ্রামের প্রতিবেশী সম্পর্কিত নারীদের জন্য পান-বাতাসা, পানের মসলা প্রভৃতি নিয়ে আসার প্রথা মালোসমাজে প্রচলিত। নতুবা তাকে নানাভাবে নিন্দা করা হয়। এ প্রথার নাম 'জামাইঠকানো'। জনৈক জামাই কোনো উপহার না নিয়েই শ্বশুরবাড়ি আসায় গ্রামের নারীরা তাকে নিন্দাপূর্বক গান পরিবেশন করে, 'জামাই খাইতে জানে, নিতে জানে, দিতে জানে না, তারে তোমরা ভদ্র বইলো না। জামাই যদি ভদ্র হইত, বাতাসার হাঁড়ি আগে দিত' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৫১১–৫১২)। মালো সম্প্রদায়ের গোষ্ঠীবদ্ধতা এবং সামাজিক রীতি-নীতি, বিধিনিষেধ-অনুশাসনের দৃষ্টান্ত রয়েছে এ উপন্যাসের 'নয়া বসত' পরিচ্ছেদে। বিশেষত অনন্তের মা ছেলেকে নিয়ে তার স্বামীর গ্রাম গোকর্ণঘাটে বসবাসের জন্য মনস্থির করলে কার পরিবারভুক্ত হয়ে সে থাকবে, এ বিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য গ্রামের মাতবররা সভায় বসে। পাশাপাশি নিজেদের বৈষয়িক ও সামাজিক বিভিন্ন প্রসঙ্গও এ বৈঠকে উত্থাপিত হয়, যা থেকে বোঝা যায় তাদের সামাজিক কাঠামো ও বিধিব্যবস্থার স্বরূপ। 'দশের বিচার' নামে অভিহিত বৈঠকের ঘোষণা নগরে-বাজারে আগেই প্রচারিত হয়, গ্রামবাসীর উপস্থিতির জন্য। এতদিন গ্রামের মাতবরেরা বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকায়, এমনকি কারো কারো গ্রামে অনুপস্থিতিহেতু এ বৈঠক মুলতবি ছিল। অবশেষে সকলে গ্রামে আসায় এটি অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যার আগে দুটি ছেলে গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে নিমন্ত্রণের বার্তা জানিয়ে দেয়, 'ঠাকুর সকল, ঘরে নি আছ, আসার একখান কথা। ভারতের বাড়িতে আজ দশজনের সভা। তোমরার নিমন্ত্রণ। পান তামুক খাইবা, দশজনের দশ কথা শুনবা' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৫০)। ভারতের বাড়ির উঠানে পাল খাটানো হয়। সেখানে ভালো আসনে গণ্যমান্য ব্যক্তিদের এবং চারপাশে গ্রামবাসীর বসার ব্যবস্থা করা হয়। রান্না ও ধান সিদ্ধ করার জন্য উঠানের বেড়া দেওয়া অংশে নারীরা বসে। গোকর্ণঘাট গ্রামের বড়ো মাতবর রামপ্রসাদ যে কোনো ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারী। তার পরেই রয়েছে রামদয়াল, নিতাইকিশোর ও কৃষ্ণচন্দ্র। এদের 'কেউ টাকার জোরে, কেউ গায়ের জোরে, ভাইয়ের জোরে, কেউ বুদ্ধির জোরে' মাতবর হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। সভায় উপস্থিত সকলের জন্য পান, তামাক ও হুকার বন্দোবস্ত ছিল। বৈঠকে জমিদারের বকেয়া খাজনা শোধ করা, ভারতের মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া, তামসীর বাপের বাজারের কায়েতদের সঙ্গে অতিমাত্রায় যোগাযোগ ও সমাদর করা এবং অনন্তের মার গোকর্ণঘাট গ্রামে বসবাসের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়। সমষ্টিমানুষের কল্যাণ ও বৈষয়িক প্রয়োজনে, নিত্যদিনের নানা সমস্যা মেটাতে দশের বিচারে সলাপরামর্শ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এভাবেই মালো সমাজের সংঘবদ্ধতা অটুট থাকে। কিন্তু একপর্যায়ে যখন সামাজিক রীতিকে তুচ্ছ করে ব্যক্তিগত স্বার্থোদ্ধারের প্রতি তারা আগ্রহী হয়, তখন গোষ্ঠীগত যূথবদ্ধতায় ভাঙন ধরে এবং তা বিশেষভাবে ত্বরান্বিত হয় তাদের আর্থিক স্বনির্ভরতার

অবসানে। লোন কোম্পানির নিকট থেকে গৃহীত অর্থ পরিশোধের অসামর্থ্য এবং তিতাস নদীর শুকিয়ে যাবার পাশাপাশি বহিরাগত স্থূলরুচির সংস্কৃতির প্রভাবে তারা যখন স্বীয় লোকঐতিহ্যিক উত্তরাধিকারকে সম্প্রসারণে ব্যর্থ হয়। বিশেষত নাগরিক সমাজের স্থূলরুচির চিত্তবিনোদন তথা যাত্রার চটুল, অশ্লীল, রঙ্গ-ব্যঙ্গসর্বস্ব তামাসার প্রাবল্যে মালোদের নিজস্বতার পরিচয়বহ সংস্কৃতি ও স্বকীয় জীবনধারায় ভাঙন অনিবার্য হয়ে পড়ে–

> মালোদের নিজস্ব একটা সংস্কৃতি ছিল। গানে গল্পে প্রবাদে এবং লোকসাহিত্যের অন্যান্য মালমসলায় সে সংস্কৃতি ছিল অপূর্ব। ... মালো ভিন্ন অপর কারো পক্ষে সে সংস্কৃতির ভিতরে প্রবেশ করার বা তার থেকে রস গ্রহণ করার পথ সুগম ছিল না। ... আজ কোথায় যেন তাদের সে সংস্কৃতিতে ভাঙ্গন ধরিয়াছে। ... যাত্রার দল যেন কঠোর কুঠারাঘাতে তার মূলটুকু কাটিয়া দিয়াছে। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৫৪৫)

৬. লোকপ্রযুক্তি

এ উপন্যাসে গ্রামীণ সমাজে নিত্যদিনের কাজে প্রচলিত লোকপ্রযুক্তিগত বিভিন্ন কৌশলের পরিচয় রয়েছে, যা প্রয়োগ করে কাজে সফল হওয়ার প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদেই রয়েছে বাঁশ দিয়ে তৈরি সাঁকোর প্রসঙ্গ। বর্ষার প্লাবনে নদীসংলগ্ন এলাকা জলমগ্ন হলে সেখানকার বাসিন্দাদের যাতায়াতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। ফলে নদীতীরবর্তী লোকসমাজে সাঁকোই তখন হয়ে ওঠে একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাতায়াতের অবলম্বন। লক্ষণীয়, এটি বাঙালি লোকসমাজে প্রচলিত প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী লোকপ্রযুক্তি, যার উল্লেখ *চর্যাপদে*-ও রয়েছে। তেমনিভাবে মালো সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে মাছচাষ সংক্রান্ত কৌশলাদি। নয়ানপুরের বোধাই মালো বড়ো দিঘি ইজারা নিয়ে মাছের পোনা চাষ করে। মাছের খাবার দেওয়া, যত্ন নেওয়া, সেগুলো বড়ো হলে বিক্রির বন্দোবস্ত তার ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের অংশ। তবে এক্ষেত্রে অধিক বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায় শুকদেবপুরের মোড়লের কর্মকাণ্ডে। তার মালিকানাধীন চারটি বড়ো বিল বর্ষাকালে পানিতে সয়লাব হয়ে যায়। নদীর সঙ্গে সংযুক্ত বিধায় তখন অজস্র মাছ বিলে ভেসে আসে। পানি কমে গেলে বিলগুলিতে বাঁধ দিয়ে মাছ ধরা হয়। বিপুল পরিমাণ মাছ ধরতে শুধু শুকদেবপুরের মালোরাই নয়, বরং বহুদূরের গোকর্ণঘাট এবং অন্যান্য গ্রামের মানুষেরাও দীর্ঘ ছয় মাসের জন্য প্রবাসে যায়। লক্ষণীয়, এ কাজে পুরুষদের চেয়ে নারীরাই বেশি অংশগ্রহণ করে। কেননা, মাছ কাটা ও সংরক্ষণের কাজে তারাই বেশি পটু। সেকারণে তাদের সাময়িক বাসস্থানের জন্য মোড়ল চালাঘর স্থাপন করে। প্রবাসীরা সেখানে সমবেত হয়ে এ কাজে অংশ নেয়–

> কারোর সঙ্গে কারোর কোনকালে দেখাসাক্ষাৎ ছিল না। এখানে আসিয়া সকলে এক সংসারের লোক হইয়া গিয়াছে। এক সঙ্গে খায়, থাকে, কাজ করে। ... মেয়েরা বঁটি মেলিয়া কাতারে কাতারে বসিয়া যায়। পুরুষেরা মাছের ঝুড়ি ধরাধরি করিয়া আনিয়া তাহাদের পাশে স্তূপ করিতে থাকে। ... এতবড় মাছটাকে পলকে ঘুরাইয়া পেটে পিঠে গলায় তিন পোচ দিয়া ঘাড়ের উপর দিয়া ছুঁড়িয়া মারে, সে মাছ যথাস্থানে জড়ো হয়। আরেক দল পুরুষ সেখান হইতে নিয়া ডাঙ্গিতে তোলে শুকাইবার জন্য। দিনের পর দিন এইভাবে তিন মাস কাজ চলে। ছয় মাসের প্রবাস সারিয়া তারা যার যার দেশে পাড়ি জমায়। ইহাকে বলে 'খলা-বাওয়া।' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪২৯)

কিশোর, সুবল ও তিলকচাঁদ দুর্দিনে আর্থিক সাচ্ছন্দ্যের প্রয়োজনে শুকদেবপুরে প্রবাসে গিয়েছিল। ধৃত মাছ শুকিয়ে শুটকি বানানোর প্রক্রিয়া লোকসমাজে প্রচলিত। মাছ রোদে

শুকাতে দেওয়া হলে কাক চেষ্টা করে সেটি আত্মসাৎ করতে। সেকারণে কালোর মা মাছ পাহারা দিতে চৌকি পেতে কঞ্চি নিয়ে বসে। সে কাকের কয়েকটা ছেঁড়াপালক দড়িতে বেঁধে কঞ্চির আগাতে ঝোলায়। এর ফলে কাক ভয় পেয়ে মাছ চুরি থেকে দূরে থাকে। মাছ ধরার জন্য সুতায় তৈরি জাল বানানোর প্রক্রিয়াতেও রয়েছে লোকপ্রযুক্তি। লক্ষণীয়, কিশোর ও সুবল স্কুলে পাঠগ্রহণে অমনোযোগী বলে পরিবার থেকে তাদের ওপর সুতা পাকানো ও জাল বোনার নির্দেশ আসে। তারা তিতাসের প্রশস্ত তীরে এক দৌড়ের লম্বা পথে সুতা মেলে। এরপর বাঁশের চরকিতে কাঠি লাগিয়ে দুজনে প্রবল শক্তিতে সেসব সুতা পাকাত। আবার জাল বোনার জন্য পায়ের বুড়া আঙুলে ঠেকিয়ে দুজনেই দ্রুতগতিতে তকলি চালায়। এর ফলে জালে অনেক গিঁট পড়লেও কাজ খুব দ্রুত এগিয়ে যায়। 'নয়াবসত' পরিচ্ছেদে গোকর্ণঘাট গ্রামে আগত অনন্তের মার জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম হয়ে ওঠে সুতা দিয়ে মাছের জাল বোনার কাজ। তার বাবা জেলে হলেও অনন্তের মা এর আগে এ কাজ করেনি। ফলে কালোর মায়ের জাল বোনার জন্য ধারে প্রাপ্ত দশ সের সুতা নিয়ে সে দুশ্চিন্তায় পড়লে বাসন্তী তাকে প্রয়োজনীয় কৌশল শিখিয়ে দেয়। "দুপুরের পর সুবলার বউ কতকগুলি সুতা কাটার হাতিয়ার লইয়া হাজির হইল। সেগুলি মাটিতে নামাইয়া বলিল, 'এই নেও বড় টাকু, মোটা সুতার লাগি; এই নেও ছোট টাকু, চিকন সুতার। আর এই একখান পিঁড়ি দিলাম, ঘাটে গিয়া শণের লাছি এর উপরে আছড়াইয়া ধুইয়া আনবা। তারিপর রইদে শুখাইবা' " (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৪৯)। অনন্তের মা তার নির্দেশ মেনে সাত দিনে চৌদ্দ গোছা সুতা তৈরি করে। এর সাতটি মোটা, অন্যগুলো চিকন সুতার। মোটা সুতা এক টাকা এবং সরু সুতা দুই টাকা সের দরে সে এসব বিক্রি করে কারবারীর কাছে। এর আরও বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে 'রামধনু' পরিচ্ছেদে। মালো নারীরা বাড়ির উঠানে সুতা পাকায়। চোঙ্গার মতো মুখাকৃতির একটি খুঁটি স্থায়ীভাবে মাটিতে পোঁতা থাকে। এর ওপর সুতা ভর্তি চাকতি বসানো হয়। টেকোয় সুতা বেঁধে উঠানের এক কিনারা থেকে অন্য কিনারা পর্যন্ত পোঁতকে তারা বেড় দিয়ে আনে। 'তারপর ডান হাঁটুর কাপড় একটু গুটাইয়া লইয়া, নগ্ন ঊরু তুলিয়া তুলিয়া হাতের তেলোয় ঘষা মারিয়া ঊরুতে টেকো ঘুরায়। একবারের ঘুরানিতে টেকো হাজার বার ঘুরে' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৫০১)। দশবার টেকো ঘুরলে এক বেড়ের সুতা তৈরি হয়ে যায়। এর পর ডান হাতের তালুতে টেকোর ডাঁট বা হাতল ঘুরানো হয়। বাঁহাত রাখা হয় টেকোর ঘাড়ে। সেই নারী সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে চললে পাকানো সুতা টেকোতে গুটানোর কাজও শেষ হয়ে যায়। যদিও এসব নিতান্তই পুরুষালি কাজ, কিন্তু মালো পরিবারে নারীপুরুষ নির্বিশেষে যে কেউ এ কাজ করে। কারণ জেলেরা নদীতে মাছ ধরা, ভাড়ায় নৌকা বাওয়া ও অন্য কাজে ব্যস্ত থাকে। লোকপ্রযুক্তির এ ধরনের দৃষ্টান্ত মালোদের প্রাত্যহিক জীবিকা নির্বাহের বিশেষ সহায়ক অবলম্বন। এ উপন্যাসের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 'রাঙা নাও'-এ নৌকাবাইচের নৌকা বানানোর বিভিন্ন পর্যায়ের অনুপুঙ্খ বর্ণনায় প্রতীয়মান, লেখক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে গ্রামীণ লোকসমাজে বহুলব্যবহৃত লোকযান নৌকা সম্পর্কে সতর্ক পর্যবেক্ষণ করেছেন। বিরামপুর গ্রামের সম্পন্ন গৃহস্থ কাদিরের ছেলে ছাদির নৌকাবাইচের জন্য দেড়শ হাত লম্বা লিকলিকে পাতাম নৌকা বানানোর আয়োজন করে। অনেকটা ভেলার মতো দেখতে, ওপরে ছইটানা কাঠের বিশাল টুকরা বা 'চালি'তে চড়ে দুপাশ থেকে মোটা লগি তিতাসের স্রোতে ঠেলে গাছের গুঁড়ি ভাসিয়ে আনে দুজন মালো। সেটি কেটেই নৌকা তৈরি হয়। পরদিন চারজন করাতি এসে তিতাসের পাড়ে একস্থানে 'আড়া' বেঁধে প্রকাণ্ড গাছের গুঁড়িটিকে আড়াআড়িভাবে বসিয়ে করাত দিয়ে সেটিকে চিরে টুকরো টুকরো করে দুইদিনে।

এরপর তিতাসের পারে স্থায়ী চালাঘর তুলে চারজন ছুতারমিস্ত্রি বাক্সভতি সরঞ্জাম নিয়ে কয়েক দিনে নৌকার কাঠামো গড়ে তোলে। এসব কর্মকাণ্ড ছাদিরের বালকপুত্র রমুকে যেন ব্যাখ্যাতীত এক জগতে আহ্বান জানায়। তাই সে অধিকাংশ সময় নৌকা গড়ার কাজ দেখায় মনোনিবেশ করে–

> আগাপাছার 'ছেউ' ঠিক করিয়া যেদিন তাহারা নাও 'টাঙ্গিল', সেদিন রমুর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। নৌকার মেরুদণ্ড মাত্র পত্তন করা হইয়াছে। সেই মেরুদণ্ডের ডগা আড় হইয়া আকাশ ঠেলিয়া কতখানি যে উপরে উঠিয়াছে, রমুর ক্ষুদ্র দৃষ্টি তার কি পরিমাপ করিবে। কিন্তু মিস্ত্রী দুইজন অত উঁচুতে গিয়া বসিয়াও কেমন হাতুড়ি পিটাইতেছে, আর পেরেক ঠুকিতেছে।
>
> মাপজোখ লইয়া এই মেরুদণ্ড ঠিক করিতে কয়েকদিন লাগিল। তারপর পুরাদমে শুরু হইল কাজ। এক একটা তক্তায় কাদা মাখাইয়া আগুনে পোড়াইয়া টান দিয়া মোড়ন দিয়া বাঁকাইয়া, খাঁক কাটিয়া, জোড়া দেয়, একদিকে সামান্য একটু বসিলে, আরেকদিক ঘুরাইয়া খাঁজের উপর বসাইয়া হাতুড়ি দিয়া পিটিতে থাকে ... দেখিতে দেখিতে নৌকার অস্থিমাংস জোড়া লাগিতে লাগিল। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৫২৮)

নৌকা তৈরি হবার পর সেটি কাত করে তলার অংশ পালিশ করে ছুতারমিস্ত্রিরা কাজের যবনিকা টানে। এরপর বহুদিনের পরিশ্রমের ফসল তথা নৌকাটিকে ঘিরে তাদের মন আনন্দে, তৃপ্তিতে ভরে ওঠে–

> এমন একখান চিজ তারা গড়িয়া দিল যে চিজ অনেক–অনেকদিন পর্যন্ত জলের উপর ভাসিবে– কত লোক তাতে চড়িবে, বসিবে, নদী পার হইবে–এক দেশ হইতে আরেক দেশে যাইবে–কত জায়গায় দৌড়াইবে, বখশিস পাইবে–আর একজনার হাতের স্বাক্ষর সগর্বে বহন করিতে থাকিবে। কেউ জানিবে না, কারা গড়িয়াছিল, কাদের বিন্দু বিন্দু শ্রম ও বুদ্ধির সঞ্চয় সম্বল করিয়া ধীরে ধীরে সে গড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু নাও? সে কি ভুলিয়া যাইবে এই চারজনকে? কিছুতেই না। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৫৩২)

সেকারণেই তারা আত্মগর্বে বলীয়ান হয়ে লোকজন জড়ো করে নাচসহ গান গায় হাততালি বাজিয়ে 'শুনরে নগইরা লোক, নাও গড়াইতে কত সুখ' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৫৩২)। এরপর তিনজন কারিগর নৌকাটিতে বিভিন্ন রঙে লতা, পাতা, সাপ, ময়ূর ও একজোড়া পালোয়ান আঁকে। এভাবেই নৌকাবাইচের নৌকা তৈরি হলে ছাদির সেটি জলে ভাসায়। এ উপলক্ষ্যে সে পাড়ার লোকজনকে ডেকে এনে এক হাঁড়ি বাতাসাও বিতরণ করে। এরপর তারা নৌকা জলে নামায় এ বুলি আউড়ে, "জোর আছে? সকলে বলিল, আছে। আবার সকলে বলিল, যে জোর থুইয়া জোর না করে তার জোড় খায় মরা কাষ্ঠে রে-এ-এ" (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৫৩২)। তারপর তারা একত্রে সেই নৌকাকে তিতাসের বুকে ভাসায়।

৭. লোকউৎসব

এ উপন্যাসে তিতাসপাড়ের গ্রামীণ লোকসমাজে প্রচলিত বিভিন্ন উৎসবের বিস্তৃত পরিচয় রয়েছে। এসব উৎসবের বেশির ভাগই ধর্মীয়, তবে সামাজিক উৎসব এবং চিত্ত বিনোদনের আয়োজনও এর অন্তর্গত। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই এসব উৎসব পালন করে। মালোপাড়ায় পালিত হয় বাসন্তী উৎসব। এর সঙ্গে ধর্মের যোগ নেই, বরং কৃষিভিত্তিক সমাজে ঋতু পরিক্রমায় বসন্তের আবির্ভাবকে বরণ করে নিতে এটি পালিত হয়। আরও রয়েছে উত্তরায়ণ সংক্রান্তি। তবে ধর্মনির্ভর উৎসবের সংখ্যাই বেশি। এর মধ্যে রয়েছে মাঘ মণ্ডলের

ব্রত, দোল পূর্ণিমার উৎসব, হোলি উৎসব, কালীপূজা, মনসা পূজা, যাত্রার আয়োজন, মনসার ভাসানগত পুথি পাঠ প্রভৃতি, যা ধর্মীয় মূল্যবোধ ও ঐতিহ্যকে অনুসরণ করে সমাজে বহুকাল ধরে প্রচলিত। বিয়ে ও অন্নপ্রাশনও ধর্মীয় উৎসবের অন্তর্গত। মুসলমান সমাজে প্রচলিত উৎসবের মধ্যে রয়েছে ইদ ও মহররম। প্রকৃতিতে নানা রঙের সমাহার নিত্যকাজে ব্যস্ত মালোদের মনকেও রঙিন করে তোলে। তারা বসন্তকালে নতুন রঙে রাঙায় মাছ ধরার নৌকাগুলিকে। এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে মঙ্গলাচার। গৃহবধূরা ছোটো থালায় আবির ও ধানদূর্বা নেয়। নৌকার মালিক সেই থালা থেকে আবির নিয়ে গলুইতে মেখে দেয়। সে ধানদূর্বাগুলি আঙুলে তুলে ভক্তিসহকারে আবির মাখানো স্থানের ওপর রাখে। এ সময়ে তার স্ত্রী জোকার দেয়। এভাবেই বসন্ত বন্দনার মাধ্যমে নিজেদের সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্যকে স্থায়ী করার আকাঙ্ক্ষাবশত তারা এ উৎসব পালন করে। উত্তরায়ণ সংক্রান্তি মালোদের পালিত সাংস্কৃতিক উৎসব। পৌষ মাসের শেষদিন এটি যাপিত হয়। এ অনুষ্ঠানে প্রাধান্য পায় বিবিধ খাবারের বর্ণাঢ্য আয়োজন। নতুন ধান উঠলে তা ভাঙিয়ে চালের গুড়ি তৈরি করা হয় পিঠা এবং অন্যান্য খাদ্য তৈরির জন্য। একারণে উৎসবের অন্তত পাঁচ-ছয়দিন আগেই চাল গুড়ো করে রোদে শুকিয়ে রাখা হয়। নতুন চালের মুড়ি ভেজে ছাতুও বানানো হয়। উৎসবের আগের রাতে মেয়েরা পিঠা বানিয়ে রাখে। এসব পিঠা বিভিন্ন ধরনের এবং বৈচিত্র্যময় স্বাদে ভরপুর। উৎসবের দিন সকালে মালোরা মাছ ধরা থেকে বিরত থাকে। তবে কেউ কেউ গেলেও মাছ না ধরেই ফিরে আসে উৎসবে অংশ নিতে। তারা বাড়ি বাড়ি ঘুরে পিঠা খাওয়ার নিমন্ত্রণ সফল করে। সকলের খাওয়াদাওয়া শেষ হলে গ্রামে কীর্তন শুরু হয়। সারা গ্রাম ঘুরে নাচ-গানে তারা মুখরিত হয়। এর সঙ্গে যুক্ত হয় হরির লুট। এতে কদমা ও বাতাসা বিতরণ ও তা ধরার অলিখিত প্রতিযোগিতা চলে । সাহাপাড়া, যোগীপাড়া ও মালোপাড়া থেকে কীর্তনের পৃথক দল বের হলেও মালোরাই এতে সবচেয়ে বেশি আনন্দ করে। নাচগান, হৈহুল্লোড়, ঠাট্টা, তামাসার মধ্য দিয়ে জমজমাটভাবে কীর্তন পালিত হয়। নারীরা পরিজনের জন্য বিভিন্ন মুখরোচক, সুস্বাদু খাবার রান্না করে। এ উপন্যাসে ধর্মীয় লোকউৎসবের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখিত হয়েছে মাঘমণ্ডলের ব্রত। মাঘমাসের শেষদিন মালোপাড়ার কুমারী নারীরা মাঘমণ্ডলের পূজা ও ব্রত পালন করে। এর উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিয়ের উপযুক্ত পাত্র পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা। এ উৎসবের আচার হিসেবে তারা মাঘ মাসে প্রতিদিন তিতাস নদীতে প্রাতঃস্নান করে, এরপর বাড়ি ফিরে ভাঁটফুল ও দূর্বাদলে বাঁধা ঝুটার জল দিয়ে সিঁড়িতে পূজা নিবেদন করে, সেইসঙ্গে এ মন্ত্র পাঠ করে– 'লও লও সুরুজ ঠাকুর লও ঝুটার জল, মাপিয়া জুখিয়া দিব সপ্ত আঁজল' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪১৪)। ব্রতের আচার হিসেবে তরুণ কলাগাছের এক হাত পরিমাণ লম্বা করে কাটা ফালি ও বাঁশের সরু শলাকা বিদ্ধ করে ভিত তৈরি করা হয়। এর ওপর গড়ে তোলা হয় রঙিন কাগজের চৌয়ারি ঘর। মাঘ মাসের শেষদিন ব্রত পরিসমাপ্ত হলে ব্রতিনীরা সেই চৌয়ারি মাথায় নিয়ে তিতাসের জলে ভাসায়, এর সঙ্গে ঢোল-কাসি বাজে, নারীরা গীত পরিবেশন করে। উঠানে আঁকা আলপনার মাঝে একটি চৌকিতে বসে বাসন্তী ছাতা মাথায় দিয়ে সেটি ধীরে ধীরে ঘুরাতে থাকে। তার মা এর ওপর খই ও নাড়ু ঢেলে দেয়, যা ধরতে পাড়ার ছেলেরা রীতিমতো কাড়াকাড়ি করে। নারীদের কণ্ঠে গীত হয় 'সখি ঐ তো ফুলের পালঙ রইলো, কই কাঁলাচাঁদ আইলো' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪১৪)। এর সঙ্গে দুখাই বাদ্যকর ঢোল ও তার ছেলে কাসি বাজায়। এ উৎসব বহুদিন ধরে চলে আসছে। এরপর কুমারী মালো নারীরা গীত পরিবেশন করতে করতেই তাদের চৌয়ারিগুলো মাথায় নিয়ে তিতাসের জলে ভাসায়। মালো ছেলেরা সেগুলো ধরার জন্য হট্টগোল করে। 'প্রবাস খণ্ড' পরিচ্ছেদে দোল

পূর্ণিমার উৎসবের বিবরণ রয়েছে। কিশোর, সুবল ও তিলকচাঁদ প্রবাসে গিয়ে শুকদেবপুর গ্রামে আয়োজিত এ উৎসবে অংশ নেয়। চৈত্রের মাঝামাঝি এটি পালিত হয়। এর অংশ হিসেবে গ্রামের মোড়ল সকাল থেকে রাত অবধি হোলি, গানবাজনা, রং খেলা ও খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করে। রাধাকৃষ্ণের পরস্পরের প্রতি ভালোবাসার স্মৃতিময়তা এ উৎসবের প্রচলন ঘটিয়েছে– 'কে কাকে নিয়া কখন দুলিয়াছে। সেই যে দোলা দিয়াছিল তারা তাদের দোলনায়, স্মৃতির অতলে তারই ঢেউ। অমর হইয়া লাগিয়া গিয়াছে গগনে পবনে বনে বনে, মানুষের মনে মনে। মানুষ নিজেকে নিজে রাঙায়। তাতেও পূর্ণ তৃপ্তি পায় না। প্রিয়জনকে রাঙায়, তাতেও পূর্ণ তৃপ্তি পায় না– তখন তারা আত্মপর বিচার না করিয়া সকলকেই রাঙাইয়া আপন করিয়া তুলিতে চায়' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪২৭–৪২৮)। হোলি খেলার বিশেষ আকর্ষণ হলো রং ছিটানোর উল্লাস। এজন্য ঝুড়িভর্তি আবির এনে গামলায় গোলা হয়। এছাড়া চারকোনা চার-তাকের একটি মাটির সিঁড়ির ওপর দুই পাশে পোঁতা দুটি বাঁশের সঙ্গে দড়ি বেঁধে একটি সালু কাপড়ে কৃষ্ণের পুতুল তৈরি করে ঝোলানো হয়। দর্শনার্থীরা এসে এটিতে আবির মাখিয়ে দোল দিয়ে যায়। এরপর গ্রামের বাসিন্দারা একে অন্যকে আবির মাখিয়ে দেয়। এ ঘটনাকে ভিত্তি করেই কিশোরের সঙ্গে উপন্যাসে নামহীন তার স্ত্রীর পরিচয় এবং পরিণয় ঘটে। হোলি খেলা শেষ হলে গানের আসর বসে। সেখানে একজনকে হোলির রাজা সাজানো হয়। 'তার গলায় কলাগাছের খোলের মালা, কলাপাতার টোপর, পরনে ছেঁড়া ধুতি, গায়ে ছেঁড়া ফতুয়া। মাঝে মাঝে উঠিয়া কোমর বাঁকাইয়া নাচে, আবার বসিয়া বিরাম নেয়। বুড়া মানুষ' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৩০)। যেহেতু রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়কে কেন্দ্র করে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন, তাই গানের আসরে নারীরা রাধার এবং পুরুষেরা কৃষ্ণের দলে বিভক্ত হয়ে গান করে। দোল-মণ্ডলের চারদিকে সমবেত গ্রামবাসী করতাল নিয়ে বাজনা বাজিয়ে নাচগানসহযোগে এ অনুষ্ঠানকে জমজমাট করে তোলে। 'জন্ম মৃত্যু বিবাহ' পরিচ্ছেদেও এ উৎসবের বৃত্তান্ত রয়েছে। গোকর্ণঘাট গ্রামে আড়ম্বরের সঙ্গে এ উৎসব পালিত হয়। স্নান সেরে বাসন্তী, অনন্ত ও অনন্তর মা রাধাগোবিন্দের মন্দিরে আবির দেওয়ার পরিকল্পনা করে। একারণে বাসন্তী অনন্তকে দিয়ে বাজার থেকে আবির কিনে আনায়। অপ্রকৃতিস্থ কিশোর আকস্মিকভাবে সামনে এসে আবির মাখার বায়না করায় অনন্তের মা তাকে আবির মেখে দেয়। অনন্ত দেখে, 'রূপকথার রাজ্যের লোকের মত পাগলটার চেহারা। আর তার মা ওটাকে আবির মাখাইতেছে। পাগলটা আবিরের থালা ফেলিয়া দিয়াছে' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৭৫)। এটিই এ দুই নরনারীর জীবনের ট্র্যাজেডি যে, চার বছর আগের দোলপূর্ণিমায় যারা পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিল, সময়ের ব্যবধানে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। মানবজীবন এতটাই নাটকীয়তায় ভরা যে, দীর্ঘদিন পর সেই দম্পতিই আবার একে অন্যকে আবিরে রঞ্জিত করে। তবে উন্মাদ কিশোর জানে না, সেই নারী নিতান্তই দুর্ঘটনার শিকার হয়ে তার জীবন থেকে হারিয়ে গিয়েছিল। এ ঘটনা তাদের পুনর্মিলনের সুযোগ করে দেয়। বাসন্তী শেষ পর্যন্ত রাধাগোবিন্দের মন্দিরে আবির দিতে যাওয়ার ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান করে এবং অনন্তকেই পরম আদরে আবিরে রঞ্জিত করে। সন্তানহীন-অকালেই বিধবা এ নারীর মাতৃত্বের আকুলতা সমগ্র উপন্যাসেই অনন্তকে ঘিরে আবর্তিত হয়।

মালোদের ধর্মীয় উৎসবের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে প্রাত্যহিক জীবনে ঘটে চলা বিভিন্ন ঘটনার সংযোগ। নতুন শিশুর জন্মকে কেন্দ্র করে বিবিধ লোকাচার সম্পর্কিত উৎসবের পরিচয় পাওয়া যায়। 'জন্ম মৃত্যু বিবাহ' পরিচ্ছেদে কালোবরণের পরিবারে আগত নবজাতকদের ভূমিষ্ঠ হওয়া সংক্রান্ত অন্নপ্রাশন এরই দৃষ্টান্ত। কালোবরণের বাবা মৃত। তার মা সংসারের কর্ত্রী। কালোবরণ ও তার

দুই ভাই বিবাহিত। আর্থিকভাবে যথেষ্ট সংগতিপন্ন বিধায় এ পরিবারে অন্নপ্রাশন জাঁকজমকের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। কিছুদিন আগে মেজোবৌ সন্তান প্রসব করে। তখন কালোর মা অনন্তের মাকে আহ্বান জানায়, 'জোকার' দিয়ে যেতে। শুধু সেই নয়, প্রতিবেশী অন্য নারীরাও কালোবরণের বাড়িতে এসেছিল নতুন শিশুকে এভাবে সাদরে অভ্যর্থনা জানাতে। লোকসমাজে এ নিয়ম মান্য, 'ছাইলা হইলে পাঁচ ঝাড় জোকার, মাইয়া হইলে তিন ঝাড়' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৬১)। সকলেই পরম মমতা ও ভালোবাসায় তাকে কাছে টেনে নেয়। নবজাতক জন্মের ষষ্ঠ দিনে পালিত হয় দোয়াত কলম দেওয়ার অনুষ্ঠান। 'এই রাতে চিত্রগুপ্ত আসিয়া সে দোয়াত হইতে কালি তুলিয়া সেই কলমের সাহায্যে শিশুর কপালে লিখিয়া দিয়া যায় তার ভাগ্যলিপি' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৬১)। ধর্মীয় লোকসংস্কার ও লোকাচার মিলে মিশে মালোদের চেতনালোককে কীভাবে প্রভাবিত করে, তা এসব বৃত্তান্ত থেকে অনুধাবন করা চলে। অষ্টম দিনে পালিত হয় আট-কলাই। এদিন পাড়ার ছেলেদের খই, ভাজা-কলাই, বাতাসা প্রভৃতি বিতরণ করা হয়। তেরো দিন পর অশৌচ অন্ত পালিত হয়। এদিন নাপিত বাড়ি এসে কালাবরণ ও তার ভাইদের দাড়ি কামিয়ে যায়। মন্ত্রপাঠ শেষে পুরোহিত উঠে গেলে উঠানে চাটাই পেতে এতে ধান ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এরপর নতুন শাড়ি পরে, নতুন রঙিন রুমালে জড়িয়ে মেজোবৌ ছেলেকে কোলে নিয়ে চাটাইয়ের ওপর রাখা ধানগুলো সারা চাটাইয়ে ছড়িয়ে দেয়। তখন সেখানে সমবেত নারীরা কৃষ্ণের পৌরাণিক আখ্যানসম্পৃক্ত সংগীত পরিবেশন করে। এরপর পুরোহিতকে দক্ষিণা দিয়ে নবজাতকের মুখে প্রসাদ দেওয়ার শুভ দিন জেনে নেয়। এ অনুষ্ঠানের নামই অন্নপ্রাশন। সেদিন বাড়িতে নিমন্ত্রিত নারীরা শিশুকে নিয়ে গীত গায়। এদিন অনুষ্ঠান শুরু হয় স্নানযাত্রার মধ্য দিয়ে। ছেলে কোলে নেওয়া ছোটো বৌকে মাঝে রেখে নারীরা গান গাইতে গাইতে তিতাসের তীরে যায়। 'ছোট বউ তিতাসকে নিজে তিনবার প্রণাম করিল, ছেলেকেও তিনবার প্রণাম করাইল। এক অঞ্জলি জল লইয়া তার মাথা ধোয়াইল। শাড়ির আঁচল দিয়া মুছিয়া নদীকে আবার নমস্কার করিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিল' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৬২)। যে নদীকে ঘিরে মালোদের জীবিকা নির্বাহ হয়, এর সঙ্গে মানবপ্রজন্মের গ্রন্থনা এভাবেই বিভিন্ন ধর্মীয় সংস্কার, আচার ও উৎসবের আবরণে ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকে। শিশুকে নিয়ে বাড়ি ফিরে খানিকটা সময় বিশ্রামশেষে তারা বাড়ি থেকে রান্নাকরা একথালা পরমান্ন নিয়ে রাধামাধবের মন্দিরে যায়। সেটিকে ঠাকুরের নিকট নিবেদন করে প্রসাদ বিতরণ করা হয় শুভার্থীদের মাঝে। ছোটো বৌ তার ছেলের মুখে সেই প্রসাদ দেওয়ার পর বাকিটা অন্য ছেলেদের মাঝে বিতরণ করা হয়। এভাবেই শিশুর জন্মদান এবং তাকে মালোসমাজে সাদরে গ্রহণ করে নেওয়ার ব্যাপারটি এসব অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে অন্নপ্রাশনের পরিণতিতে পরিসমাপ্ত হয়।

মালোপাড়ায় সবচেয়ে বেশি আড়ম্বরের সঙ্গে পালিত হয় কালীপূজা। প্রতিমা নির্মাণের জন্য ভিন্ন গ্রাম থেকে কারিগর আসে এবং পূজার একমাস আগেই প্রতিমা বানানো হয়। বাঁশের দীর্ঘ কাঠামোটি পাঁচ দিন ধরে তৈরি হয়। সেটিকে খড় ও পাটের সরু দড়ি দিয়ে পেঁচিয়ে প্রতিমার অবয়ব দেওয়া হয়। মাথাহীন হাত, পা ও শরীরের আকৃতির কারণে সেটিকে অবশ্য মানুষের মতোই দেখায়। এসব কাজ শেষ হলে মাটির সঙ্গে কাটা পাটের কুচি মিশিয়ে পানি ঢেলে সেটিকে যথাসম্ভব নরম করা হয়। এ কাজের ভার মালোপাড়ার ছেলেদের। 'তারা নাচিয়া কুদিয়া পাড়াইয়া মাড়াইয়া সে মাটি নরম করিল। এই মাটিতে আকাশ-ছোঁয়া মূর্তি তৈয়ার হইবে। সে মাটির কাজ করা বড় গৌরবের, বিশেষত ছেলেদের পক্ষে' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৬৪)। কারিগররা সেই মাটি দিয়ে প্রতিমা নির্মাণ করে। এরপর এর ওপর সাদা খড়িগোলা

লাগিয়ে পালিশ করে এরপর বিভিন্ন রঙে একে সাজানো হয়। প্রতিমার চোখ আঁকা হলে সেদিন রাতে কালীপূজা করা হয়। প্রতিমার দেহে রং দিয়ে সাজসজ্জার কাজটি করা হয় সকলের আড়ালে। পাল খাটিয়ে পূজামণ্ডপ ঢেকে কারিগররা এ কাজ করে। পূজার ধর্মাচার পালনের জন্য কালোর মা নির্ধারণ করে, কে সংযমীর কাজ করবে। যেহেতু তার বাড়িতে এ আয়োজন চলে, কাজেই এ ব্যাপারে সে-ই সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী। অনন্তের মা ও বৃন্দার মাকে নিয়ে সে নিজেই সংযমীর দায়িত্ব পালন করে। 'সংযমী যারা থাকে তারা আগের দিন নিরামিষ খায়, পূজার দিন প্রাতঃস্নান করে। পূজার জল তোলে, ফুল বাছাই করে, ভোগ নৈবেদ্য সাজায় আর ফুলের মালা গলায় নামাবলি গায়ে যে পুরোহিত পূজায় বসে তার নির্দেশমতো নানা দ্রব্য আগাইয়া দেয় এবং প্রতিমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত নানা কাজ করে' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৬৫)। প্রতিমার সাজসজ্জার কাজ শেষ হলে অনন্তের মা ধবধবে শাড়ি পরে নৈবেদ্য নিয়ে পূজামণ্ডপে প্রবেশ করে। কালীপূজা গভীর রাতে শুরু হয়। সেকারণে দর্শনার্থীদের আশ্রয় নেওয়ার প্রয়োজনে বাঁশের খুঁটির ওপর টিনের চালা বেঁধে একটি অস্থায়ী ঘর তৈরি করা হয়। বালক, যুবক, বৃদ্ধরা বাড়ি থেকে কাঁথা এনে ঘরের চটের ঢালাও বিছানার ওপর শুয়ে অপেক্ষা করে। আবার পূজামণ্ডপ ও চালাঘরের মাঝের স্থানে আগুনের কুণ্ড জ্বালিয়ে অনেকে গল্পগুজব করে সময় কাটায়। তাদের সঙ্গে ধূমপানের সরঞ্জাম হিসেবে থাকে হুকা ও তামাক। নির্দিষ্ট লগ্নে কাঁসি-ঘণ্টা বাজিয়ে পূজা সম্পন্ন হয়। দর্শনার্থীদের অংশগ্রহণে পূজা শেষ হলে প্রসাদ বিতরণ করে তাদের বিদায় জানানো হয়। অনন্তের মা সবার হাতে প্রসাদ তুলে দেয়। কালীপূজায় আনন্দ উপভোগের জন্য চারদিন ধরে আট পালা যাত্রা ও কবিগানের আয়োজনও এ উৎসবের অন্তর্গত। এক্ষেত্রে দিনের বেলা যাত্রা ও রাতে কবিগানের আয়োজন করা হয়। এসময় তারা মাছ ধরা ও পেশাগত অন্যান্য কাজ থেকে বিরত থাকে। পূজার সব আয়োজনের ব্যয়বাবদ মালোপাড়ার সকল ঘর থেকে গ্রামের মাতবররা চাঁদা তোলে।

মনসা পূজা মালোদের আরেকটি উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় লোক-উৎসব। পুরো শ্রাবণ মাসে *পদ্মাপুরাণ* পাঠ শেষ হলে তবেই এ পূজার আয়োজন করা হয়। বনমালী এ সময়ে দিনের বেলা মাছ ধরে এবং রাতের বেলা বিভিন্ন বাড়িতে পুথির আসরে *পদ্মাপুরাণ* পাঠ করে। বিশেষ ভঙ্গিযোগে পুথি পাঠ এবং তা শ্রবণে আগ্রহী শ্রোতার উপস্থিতিতে মনসাপূজার আয়োজন তাদের নিকট বেশ জমজমাট হয়ে ওঠে। শ্রাবণ মাস অতিক্রান্ত হলে *পদ্মাপুরাণ* পাঠ শেষে ঘরে ঘরে মনসা পূজার আয়োজন করা হয়। এর অন্যতম অংশ হলো জালাবিয়া। কালনাগের দংশনে মৃত স্বামী লখিন্দরকে বাঁচানোর জন্য বেহুলার অশেষ ধৈর্য ও সংগ্রামের পরিণতিতে বিজয়ী হওয়ার লোকপুরাণকে ভিত্তি করে তার স্মৃতির উদ্দেশ্যে এ অনুষ্ঠান পালিত হয়।" 'বেহুলাসতী মরা লখিন্দরকে লইয়া পুরীর বাহির হইবার সময় শাশুড়ি ও জাদিগকে কতকগুলি সিদ্ধ ধান দিয়া বলিয়াছিল, 'আমার স্বামী যেদিন বাঁচিয়া উঠিবে, এই ধানগুলিতে সেদিন চারা বাহির হইবে।' চারা তাতে যথাকালেই বাহির হইয়াছিল। এই ইতিহাস পুরাণরচয়িতার অজানা হইলেও মালোপাড়ার মেয়েদের অজানা নাই। তারা বেহুলার এয়োস্তালির স্মারকচিহ্নরূপে মনসা পূজার দিন এক অভিনব বিবাহের আয়োজন করে। ধানের চারা বা জালা এর প্রধান উপকরণ। তাই এর নাম জালা-বিয়া" (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৫১২)। এ বিয়েতে দুজন নারী বর ও কনের ভূমিকায় অভিনয় করে। প্রথমে বর সোজা হয়ে চৌকিতে দাঁড়ায়। এরপর কনে তাকে সাতবার প্রদক্ষিণ করে, পঞ্চপ্রদীপ নিজের কপালে ঠেকিয়ে তারপর বরের কপালেও স্পর্শ করায়। এরপর খই ও অতসী ফুলের রাশি মাথার ওপর ছিটিয়ে দেয়। দীপদানি আকৃতির একটি পাত্রে ধানের

চারাগুলো রেখে বরের মুখের সামনে ধরে সেগুলো দিয়ে মুখ মুছে নেয়। এভাবে জোড়ায় জোড়ায় নারীদের মধ্যে বিয়ে হতে থাকে আর একদল নারী বেহুলা-লখিন্দরের প্রণয়মূলক গান গাইতে থাকে। এসব অনুষ্ঠানের স্বতন্ত্র ভূমিকা না থাকলেও মনসাপূজার অংশ হিসেবে অবশ্যপালনীয়। শ্রাবণ মাসের শেষে মালোরা মনসাপূজা করে। অন্য পূজার চেয়ে এ পূজার আয়োজনে খরচ কম, অথচ জাঁকজমক বেশি হয়। মালোপাড়ার ছেলেরা বিল থেকে শাপলা তুলে মনসার প্রতিমাকে সাজায়। মনসার পুষ্পসজ্জার অনুষ্ঠান শেষ হলে পুরোহিত এসে পূজার আয়োজন সম্পন্ন করে। শ্রাবণের শেষ দিন পর্যন্ত *পদ্মাপুরাণ* পড়া হয়, কিন্তু পুথি সমাপ্ত হয় না। লখিন্দরের পুনর্মিলন ও মনসা-বন্দনা অংশটুকু বাকি রাখা হয় এবং তা পাঠ করা হয় মনসাপূজার পরদিন সকালে। সেদিন মালোরা মাছ ধরা বন্ধ রেখে *পদ্মাপুরাণ* পাঠ করে এবং খোল-করতাল বাজায়। আগামী বছরের জন্য সেটি পাঠশেষে তুলে রাখা হয়। একজন শ্রোতাদের বাতাসা ও খই বিতরণ করে।

৮. লোকখাদ্য

তিতাসপাড়ের গ্রামীণ সমাজের অন্তর্গত হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত বিভিন্ন খাদ্য ও খাদ্যাভ্যাসের উল্লেখ এ উপন্যাসে রয়েছে। এসব খাদ্যদ্রব্য তাদের ক্ষুধা মেটালেও এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে তাদের ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদে জোবেদ আলীর বাড়ির দুই মুনীষ করমালী ও বন্দেআলীর আলাপে জানা যায়, তারা মনিবের বাড়িতে মাগুর মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খেলেও তাদের স্ত্রীরা শাক দিয়ে একমুঠো ভাত খেতে পায় কি না, তার নিশ্চয়তা নেই। 'প্রবাস খণ্ড' পরিচ্ছেদে মাঘমণ্ডলের ব্রত পালনের অংশ হিসেবে ঘরের আলপনা সজ্জিত আঙিনায় ব্রতিনী বাসন্তী চৌকি নিয়ে মাথায় ধরা ছাতাটি ধীরে ধীরে ঘোরাতে থাকলে তার মা এর ওপর খই ও নাড়ু ঢেলে দেয়। সেখানে উপস্থিত বালকেরা সেসব কাড়াকাড়ি করে খায়। শুকদেবপুরে গানের আসরে উপস্থিত শ্রোতাদের বাতাসা পরিবেশন করা হয়। 'জন্ম মৃত্যু বিবাহ' পরিচ্ছেদে কালোর মায়ের নাতির আট-কলাই অনুষ্ঠানে পাড়ার ছেলেদের খই, ভাজা-কলাই ও বাতাসা পরিবেশন করা হয়। কালীপূজার প্রসাদ হিসেবে চিনি, বাতাসা, সন্দেশ, কলা ও আলোচাল একত্রে মেখে দলা বানিয়ে মণ্ডপে আগতদের পরিবেশন করা হয়। তাছাড়া হরির লুটে কদমা ও বাতাসা বিতরণ করা হয়। তবে এ উপন্যাসে উৎসব উপলক্ষ্যে পিঠা বানানোর মতো ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠানের বিবরণ রয়েছে 'জন্ম মৃত্যু বিবাহ' পরিচ্ছেদের অন্তর্গত উত্তরায়ণ সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে। পৌষ মাসের শেষদিন এ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষ্যে পাঁচ-ছয়দিন আগে থেকেই মালোপাড়ার ঘরে ঘরে চাল ভাঙিয়ে গুড়ো তৈরি করা হয়। এছাড়া মুড়ি ভেজে ছাতু তৈরি করা হয়। চালের গুড়ি রোদে শুকিয়ে খোলাতে ঢেলে পিঠা বানানোর জন্য তৈরি করা হয়। উৎসবের আগের দিন সারারাত ধরে মেয়েরা বিভিন্ন ধরনের ও ভিন্ন স্বাদের পিঠা বানায়। উৎসবের দিন সকালে পিঠা খাওয়ার ধুম পড়ে যায়। এদিন তাদের নদীতে মাছ ধরায় আগ্রহ থাকে না। বাড়ি বাড়ি গিয়ে তারা পিঠার আমন্ত্রণ গ্রহণ করে। এ উৎসব উপলক্ষ্যে যে কীর্তনের আয়োজন করা হয়, তাতে কদমা ও বাতাসা হরির লুট দেওয়া হয়। পুরুষেরা এতে অংশ নিলেও 'মেয়েরা ঘরে বসিয়া নানা উপকরণের পঞ্চান্ন-ব্যঞ্জন রান্না করে' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৬৯–৪৭০)। শুধু লৌকিকতার অংশ হিসেবেই নয়, এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে বিশ্বাস ও সংস্কার। রামকেশবের একমাত্র ছেলে কিশোর মাছ ধরতে প্রবাসে গিয়ে উন্মাদ হয়ে গ্রামে ফিরলে 'সে পরিবারকে জানাইল, পাগলের

মঙ্গলের জন্য 'আলন্তি'র দিনে কয়েকজন লোককে খাওয়াইবে' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৬৯)। এজন্য সে যাত্রাবাড়ির রামপ্রসাদ, প্রতিবেশী মঙ্গলা ও তার ছেলে মোহন, সুবলার শ্বশুরবাড়ির মানুষদের এবং অনন্ত ও তার মাকে নিমন্ত্রণ জানায়। 'নিমন্ত্রণ পাইয়া সুবলার শাশুড়ি মায়ে-ঝিয়ে অনেক চাউলের গুঁড়ি কুটিয়া রামকেশবের বাড়ি দিয়া আসিল। নিজেদের জন্য আগে যত গুড়ি কুটিয়া রাখিয়াছিল তাহাও পাঠাইয়া দিল। এবারের পরব তাদের বাড়িতে না হইয়া ঐ বাড়িতেই হোক' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৬৯)। বাসন্তী অনন্তের মাকে নিয়ে কিশোরদের বাড়িতে হাজির হয়। পিঠা বানানোর আয়োজন সম্পন্ন করে সে প্রথমে বানানো পিঠাটি রাধামাধবের জন্য তুলে রেখে এরপর অনন্তকে পিঠা খেতে দেয়। তাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ পর আগত মঙ্গলার মাও পিঠা বানাতে বসে। অনন্তের মা তার পাগল স্বামী কিশোরকেও প্রবল ভালোবাসার তাড়নাবশত পিঠা খেতে দেয়। 'রামধনু' পরিচ্ছেদে অনন্ত তার মৃত মায়ের পারলৌকিক কল্যাণার্থে শ্রাদ্ধের পর পিণ্ডদান করে। বাসন্তীর উদ্যোগে পিণ্ডের বন্দোবস্ত করা হয়। বাসন্তী ভাত ও বিভিন্ন তরকারির পাশাপাশি পান, সুপারি, টিকা, তামাক প্রভৃতিও কলার খোলে দেয়। ধর্মাচারের সঙ্গে প্রাত্যহিক খাদ্যাভ্যাসের যোগাযোগ এ ঘটনায় প্রতিফলিত হয়েছে। অন্যদিকে, আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে বহুদিন পর সাক্ষাৎ হলে পিঠা বানানোর আয়োজনের দৃষ্টান্ত এ উপন্যাসে লক্ষণীয়। তিন বোন নয়নতারা, উদয়তারা ও আসমানতারার বিয়ে হওয়ার দীর্ঘদিন পর একমাত্র ভাই বনমালীর সঙ্গে তাদের দেখা হয়। বোনেরা তাদের স্বামীদের নিয়ে তার বাড়িতে বেড়াতে এলে সে তাদের সমাদরের জন্য রান্নার বিবিধ সরঞ্জামের পাশাপাশি আতপ চাল, গুড়, তেল প্রভৃতিও আনে, পিঠা বানানোর জন্য। তিন বোন সারারাত জেগে গল্প করতে করতে পিঠা বানায়। *পদ্মাপুরাণ* পাঠ শেষ হলে শ্রোতাদের বাতাসা ও খই বিতরণের উল্লেখও রয়েছে এ উপন্যাসে। ছাদিরের নৌকাবাইচের নৌকা বানানোর জন্য কাঠমিস্ত্রিদের খাবারের বন্দোবস্ত হিসেবে রমুর মা খুশি চিড়া ও দুধ পাঠায়। উদয়তারা ও বনমালী অনন্তকে নিয়ে বিরামপুরের কাদির মিয়ার বাড়িতে বেড়াতে এলে তাদেরকে জলচিড়া, দুধ ও বাতাসা দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়। অনন্তর বাবা নেই বলে তার মনোলোকে নৈঃসঙ্গ্য ও কাতরতা বিদ্যমান। সে গ্রামের সমবয়সী অন্যদের লক্ষ করে সিদ্ধান্তে আসে, বাবা সম্বোধিত লোকটি তার ছেলেকে ছোলাভাজা, মটরভাজা, বিস্কুট কমলা প্রভৃতি কিনে দেয়। ছড়া বানাতে পটু উদয়তারার সংলাপে উল্লেখিত হয় লোকখাদ্যের নাম– জিলাপির পেচে-পেচে রসভরা, মণ্ডা কি ঠাণ্ডা লাগে জল ছাড়া' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৫৫৬)।

পান খাওয়ার পাশাপাশি হুকা ও কল্কিতে তামাক পানের রীতি যে বাংলার লোকসংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ এর বিবিধ দৃষ্টান্ত এ উপন্যাসের আদ্যন্ত রয়েছে। উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদ 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এ দরিদ্র মালো গৌরাঙ্গ ও তার ভাই নিত্যানন্দের দারিদ্র্যপীড়িত জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লক্ষণীয়। নিত্যানন্দ অর্থাভাবে স্ত্রী ও সন্তানদের ভরণপোষণে দিশেহারা হয়ে তামাক টানলে তার প্রতি গৌরাঙ্গ ক্ষিপ্ত হয়– 'খালি তামুক খাইলে পেট ভরব?' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪০১)। 'প্রবাস খণ্ড'-তে লক্ষণীয়, বাসন্তী তার বাবা দীননাথ মালোকে মাঘমণ্ডলের ব্রত পালনের জন্য রঙিন কাগজের চৌয়ারি বানিয়ে দিতে বললে সে এ কথায় কর্ণপাত না করে 'গম্ভীর মুখে আগুন-ভরা মালসা, টিকা-তামাক-ভরা বাঁশের চোঙা, আর দড়িবাঁধা-কলকেওয়ালা হুকা লইয়া নৌকায় চলিয়া গিয়াছে' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪১৩)। কিশোর ও সুবলের পাঠশালার শিক্ষকের কাকা বৈকুণ্ঠ চক্রবর্তী চটিপায়ে উঠানে বসে রোদ পোহাতে পোহাতে তামাক টানত। কিশোর প্রবাসযাত্রাকালে তার বাবা রামকেশব ছেলেকে বিদায়

জানাতে নদীতীরে না এসে 'ঘরে বসিয়া ঘন ঘন কেবল তামাক টানিতেছিল' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪১৬)। নৌযাত্রায় কিশোর বৃদ্ধ তিলকচাঁদকে বলেছিল, 'যাও তিলক, তামুক খাও গিয়া। দাঁড়টা দেও আমার হাতে' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪১৭)। তিলক দাঁড় টেনে ক্লান্ত হলে অবকাশের প্রয়োজনে তামাক টানতে থাকে। তারা প্রবাসে গমনকালে নয়াকান্দা গ্রামে যাত্রাবিরতি টানে। শুধু বয়স্ক পুরুষই নয়, উঠতি বয়সের তরুণেরাও এতে অভ্যস্ত। সেকারণেই এ গ্রামের জনৈক বাসিন্দার সঙ্গে কিশোর আলাপকালে পরিচিত হয় এবং হুক্কাযোগে ধূমপান করে। লোকটির বালিকা মেয়ে বাড়ি থেকে হুক্কা এনেছিল। এ প্রসঙ্গে সে দিব্যি ছড়া কাটে– 'আমি খাই তোমার হুক্কা, তুমি খাও আমার ঝিয়ের হুক্কা' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৫১৯)। বাঁশিরামের মোড়লের বাড়িতে আগত অতিথি হিসেবে মধ্যাহ্নভোজে অংশগ্রহণের পর তার স্ত্রী কিশোর, সুবল ও তিলকচাঁদকে পান খেতে দেয়। আর বাঁশিরাম মোড়ল হুক্কায় ধূমপান করে। কিশোর ও সুবল কখনো কখনো ধূমপান করে হুক্কায়। 'নয়াবসত' পরিচ্ছেদে অনন্তের মাকে তার স্বামীর গ্রাম গোকর্ণঘাটে পৌঁছে দিতে নৌকাযাত্রার একপর্যায়ে সেই নারী 'মালসা হইতে এইবার জ্বলন্ত টিকাটি তুলিয়া গৌরাঙ্গের দিকে হাত বাড়াইয়া দিল' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৪১)। পান-তামাক খাওয়া যে লোকসমাজের ব্যক্তিগত অভ্যাস নয়, বরং সমষ্টিমানুষের মধ্যে এটি বহুকাল ধরেই নারীপুরুষ নির্বিশেষে প্রচলিত, এর উদাহরণ রয়েছে এ পরিচ্ছেদেই। অনন্তের মা গোকর্ণঘাট গ্রামে এলে তার সঙ্গে পরিচিত হতে পাড়ার নারীরা আসে। তারা সমাদরের অংশ হিসেবে তার কাছে পান-তামাক খেতে চায়। কিন্তু অনন্তের মায়ের কাছে সেসব না থাকায় তারা নিজেরাই সঙ্গে আনা কাপড়ের থলে থেকে পান, চুন, সুপারি বের করে সকলে মিলে খেতে খেতে গালগল্পে ব্যস্ত হয়। পান সম্পর্কিত লোকসংস্কার ও ছড়ার উল্লেখও রয়েছে তাদের কথোপকথনে। আবার ভারতের বাড়িতে গ্রামের মাতবরদের সভা বসলে সেখানে আগতদের জন্য পান, তামাক ও হুক্কার বন্দোবস্ত করা হয়। নির্দিষ্ট সময়ে পান পরিবেশন এবং ব্যক্তিভেদে হুকা-তামাকের স্বতন্ত্র আয়োজন থেকে তাদের সামাজিক অবস্থান ও প্রভাব-প্রতিপত্তির বিষয়টি অনুধাবন করা চলে–

> কয়েকটি ছেলে হুকা কলকে মালসা ডিবা লইয়া বসিয়া গিয়াছে। অনবরত ছিলিম ধরাইয়া হাতে হাতে চালাইয়া দিতেছে ... একটা পরিষ্কার ঝকঝকে বড় কাঁসার থালাতে কয়েক বিড়া ধোয়ামোছা পান, সুচিক্কণ সুপারি, মাজাঘষা কয়েকখানি বাটিতে চুন ও অন্যান্য মশলা, থালাখানি হাতে করিয়া মধ্য বিছানায় নমস্কার করিল ভারত, 'দশজন পরমেশ্বর, আমার একখান কথা। পান নি দেওয়ার সময় অইছে?' সকলেই সম্মতিসূচক দৃষ্টিতে তাকাইল। পরে রামপ্রসাদের দৃষ্টির ইঙ্গিত পাইয়া ভারত নিজে মাতব্বরদিগকে পান বাটিয়া দিল। পরে পাড়ার একটি ছেলের হাতে থালাখানা তুলিয়া দিল। সে ক্ষিপ্রহস্তে এই জনারণ্যে পান বাটা শুরু করিল। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৫১)

ভারতের বাড়িতে বৈঠক শেষে নিজ বাড়ি ফেরার পথে রামপ্রসাদ পথ ভুলে মুসলমান সম্পন্ন গৃহস্থ এবং তার পরিচিতজন বাহারুল্লার বাড়িতে আসে। সেখানে আলাপের এক পর্যায়ে কুটুমকে আপ্যায়নের অংশ হিসেবে বাহারুল্লা তার জন্য হুকায় তামাকের বন্দোবস্ত করায় স্ত্রীকে দিয়ে। 'জন্ম মৃত্যু বিবাহ' পরিচ্ছেদে গ্রামে কালীপূজার উৎসবের রাতে পূজার মণ্ডপের কাছেই অস্থায়ীভাবে দাঁড় করানো চালাঘরে সমবেত দর্শকেরা শীতের প্রকোপ থেকে রক্ষা পেতে আগুনের কুণ্ড জ্বালিয়ে বসে। 'হাঁড়ি-ভরা তামাক টিকা কাছেই আছে। পাঁচ ছটা-হুকা জ্বলিতেছে নিবিতেছে। আগুনের তাপে আর তামাকের ধকে তারা একসঙ্গে উত্তাপিত হইতেছে' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৬৭)। 'রামধনু' পরিচ্ছেদে লক্ষণীয়, আলুচাষি কাদির ও তার ছেলে ছাদিরের আলুবোঝাই নৌকা নদীতে ডুবে যাওয়ার উপক্রম হলে ঘটনাক্রমে সেখানে উপস্থিত

বনমালী ও তার সংগীরা তাদের উদ্ধার করে। শুধু তাই নয়, বৃষ্টির মধ্যে ঠান্ডার প্রকোপ থেকে রক্ষা পেতে বনমালী সঙ্গে রাখা তামাক ও হুকা তাদের এগিয়ে দেয়।

৯. লোকপরিচ্ছদ, অলংকার ও প্রসাধন

এ উপন্যাসে তিতাসপাড়ের বাসিন্দাদের মধ্যে প্রচলিত সাজপোশাক ও প্রসাধনের উল্লেখ লক্ষণীয়। উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদে মালো নারীদের স্নানের কাজে ব্যবহৃত এক পয়সা দামের কার্বলিক সাবান ব্যবহারের প্রসঙ্গ রয়েছে। তবে সাবান যে পুরুষদের পরনের পোশাক ও দৈহিক পরিচ্ছন্নতার জন্যও জরুরি, এর দৃষ্টান্ত রয়েছে 'প্রবাস খণ্ড' পরিচ্ছেদে। সুবল কিশোর ও তিলকচাঁদ প্রবাসযাত্রায় শুকদেবপুর গ্রামের উজানিনগর খলায় বাঁশিরাম মোড়লের বাড়িতে আশ্রিত থাকে। গানের আসরে অংশগ্রহণের জন্য সুবলের পরিচ্ছন্ন পোশাক প্রয়োজন বিধায় সে জনৈক বেদেনির নিকট থেকে সাবান কেনে। নদীর ওপারের হাটে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় প্রসাধনসামগ্রী বিক্রি হলেও ভ্রাম্যমাণ বেদে বহরেও এসব পাওয়া যায়, গ্রামবাসীর চাহিদা থাকায়। 'বেদেনীরা আয়না চিরুনি সাবান বঁড়শি, মাথার কাঁটা, কাঁচের চুড়ি, পুঁতির মালা লইয়া নৌকা করিয়া শুকদেবপুরের ঘাটে বেসাত করিতে যায়' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪২৮)। গানের আসরে কিশোর, সুবল ও তিলকচাঁদ ধুতি পরে, বিশেষ কায়দায় গামছা কাঁধ থেকে বুকে ঝুলিয়ে সাজ পূর্ণ করে। অন্যদিকে নারীদের সাজসজ্জার মধ্যে শাড়ি ও হাতের চুড়ির উল্লেখ রয়েছে। মালোপাড়ার পুরুষেরা শীতকালে গাতি বা বেশ কয়েক পরতে তৈরি বিশেষ ধরনের জামা পরে। 'নয়া বসত' পরিচ্ছেদে নিত্যানন্দ তার ছোটো ভাই গৌরাঙ্গকে বলেছিল, তার পিঠে গিঁট দেওয়া গাতি খুলে দিতে। কেননা তখন ঠান্ডার প্রকোপ কমে গিয়েছিল। 'জন্ম মৃত্যু বিবাহ' পরিচ্ছেদে লক্ষণীয়, কালীপূজার অনুষ্ঠানে 'সংযমী' ধর্মীয় কার্যাদি সমাপনের দায়িত্বে নিয়োজিত অনন্তের মা ধবধবে সাদা শাড়িতে নিজেকে আচ্ছাদিত করেছিল। কাপড়ের দোকানের পাশেই বেদেরা পসরা সাজিয়ে বসে। তারা তাগা, মাদুলি, আয়না, জলে ভাসা সাবান, পুঁতির মালা, রেশমি ও কাঁচের চুড়ি প্রভৃতি বিক্রি করে। 'রামধনু' পরিচ্ছেদে উদয়তারার বিয়ের স্মৃতিচারণায় বিবৃত হয়েছে বর-কনের সাজসজ্জার পরিচয়। 'সেদিন উদয়তারার সামনে বসিয়াছিল অজানা একটা নূতন পুরুষ মানুষ– চুলদাড়ি সুন্দর করিয়া ছাঁটা, মাথায় জবজবে তেল দিয়া বাঁকা টেরি কাটা– নূতন কাপড়ে তাকে সেদিন দেবতার মত দেখা গিয়াছিল। ... তাহাকেও কি খুব সুন্দর দেখাইতেছিল না সেদিন! তিন-চার জনে ধরিয়া তাহাকে চুল আঁচড়ানো, তেল-সিন্দুর পরানো, চন্দন-তিলক লাগানো প্রভৃতি কর্ম করিয়াছিল। মালোদের পুরোহিত গলায় একটি চাদর ঝুলিয়ে ও হাতে একটি দর্পণ নিয়ে বাড়ি বাড়ি মনসাপূজা করে। দয়ালচাঁদ যাত্রায় যখন মুনি-ঋষির চরিত্রে অভিনয় করে, তখন 'কৌপীন পরিয়া নামাবলী গায়ে দিয়া খড়ম পায়ে' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৫১) সে আসরে প্রবেশ করে। মালোপাড়ার গৃহবধূরা লাল-কালো ডুরি-ডুরি শাড়ি পরে, পায়ে রুপার মল সাজিয়ে জলে আনতে কলসি কাখে ঘাটে আসে। 'রাঙা নাও' পরিচ্ছেদে মুসলমান কৃষক পরিবারের পুরুষদের মধ্যে প্রচলিত পোশাকের উল্লেখ রয়েছে। বিরামপুর গ্রামের কাদির মিয়ার নাতি রমু শিক্ষালাভের জন্য মক্তবে যায় নতুন লুঙ্গি, গেঞ্জি ও টুপি মাথায় দিয়ে। মাগন সরকার গলায় রেশমি চাদর ঝুলিয়ে মসৃণ জুতা পরে বাড়ি ফেরার একপর্যায়ে তার সঙ্গে রশিদ মোড়লের দেখা হয়। 'রশিদ মোড়লের খালি পা, লুঙ্গি পরা, গায়ে একটা ফতুয়া' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৫২৫)। আবার এ পরিচ্ছেদেই নৌকাবাইচের আসরে আগত অনন্ত ও

অনন্তবালা দুজন খেলোয়াড়কে দেখে বিস্মিত হয়েছিল। কারণ দুটি প্রকাণ্ড মাটির গামলা বিভিন্ন রঙে সাজিয়ে দুই হাতে দুটি করে বৈঠা নিয়ে তারা নদীতে সেগুলো ভাসিয়েছিল। 'উহাদের ... ফেশন করিয়া চুল দাড়ি ছাঁটাই করা, মাথায় জবজবে তেল, পরিষ্কার ধুতির উপর গায়ে সাদা গেঞ্জি' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৫৩৫)। 'ভাসমান' পরিচ্ছেদে লক্ষণীয়, মালো নারীদের নিত্যদিনের প্রয়োজনীয় সাজসজ্জা রীতিমতো বিলাসিতার পর্যায়ে চলে যায়, যাত্রার চাকচিক্যময় সাজসজ্জার অনুকরণে। 'সুযোগ পাইয়া স্যাকরারা নানারকম গহনার নমুনা লইয়া, মনোহারী দোকানের লোকেরা তেল গামছা সাবান লইয়া ঘন-ঘন আসা-যাওয়া করিতে লাগিল' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৫৫০)। ফলে বাহুল্য মনোহারি পণ্য কিনতে গিয়ে দুর্দিনের সঞ্চয় খরচে তারা অমিতব্যয়ী হয়ে ওঠে, যা তাদের আর্থিক নিরাপত্তাকে বহুলাংশেই বিপর্যস্ত করে।

১০. লোকযান

এ উপন্যাসে তিতাসপাড়ের মালো সম্প্রদায়ের জীবনধারণ ও জীবিকা নির্বাহের মুখ্য অবলম্বন হিসেবে নৌকার বিবিধ ভূমিকা লক্ষণীয়। শুধু যাতায়াতের বাহন হিসেবেই নয়, নৌকা যে লোকসংস্কৃতিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তা এ উপন্যাসের আদ্যোপান্ত রূপায়িত। প্রাচীনকাল থেকেই বাংলা ভূ-ভাগ নদীমাতৃক পরিচয়ে খ্যাত। এদেশে অজস্র নদী জালের মতো ছড়ানো বলে নৌপথে যাতায়াত, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজনে মালামাল পরিবহণ, এমনকি বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে বিবদমান সংঘর্ষেও এর নির্বিকল্প ভূমিকা এ উপন্যাসের প্রারম্ভেই উল্লেখিত। জলাশয়নির্ভর বিভিন্ন লোকগোষ্ঠী তথা বেদে, জেলে বা ধীবর, মালো, কৈবর্তরা যেমন স্বীয় অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে একে ব্যবহার করে, পাশাপাশি চাষি এবং অন্যান্য পেশাজীবী মানুষেরাও এর দ্বারস্থ হয় নিত্যদিনের প্রয়োজনে। লেখক উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদে তিতাসনদীর বিবর্তন ও প্রবহমানতার সমান্তরালে মানবজীবনপ্রবাহের রূপরেখা উপস্থাপনায় মগ-মুগল-পাঠানদের যুদ্ধবিগ্রহের ঐতিহাসিক বৃত্তান্তের সূত্রনির্দেশ করেছেন, যেখানে প্রসঙ্গক্রমে এসেছে নৌকার উল্লেখ। তবে তিতাসপারের বাসিন্দাদের প্রাত্যহিক প্রয়োজনে নৌকার ভূমিকাও বিবৃত এ পরিচ্ছেদেই। গ্রীষ্মকালে তিতাস শুকিয়ে গেলে এতে নৌকা চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। ফলে সেটিকে তুলে রাখা হয় বর্ষাকালে ব্যবহারের জন্য। সেসময়ে অনেকেই বড়ো নৌকা নিয়ে চাঁদপুরের বড়ো গাং তথা মেঘনা নদীতে 'প্রবাসে' যায়, দুর্দিনে অর্থোপার্জনের প্রয়োজনে। আবার ব্যবসার কাজে নিযুক্ত 'সওদাগরের নৌকা' বড়ো নদীতে পাল তুলে চলে। গন্তব্যে পৌঁছবার প্রয়োজনে নদীতেই যাত্রাবিরতি দিয়ে এর আরোহী মাঝিমাল্লারা 'নৌকায় রাঁধে, খায়, ঘুমাইয়া থাকে' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪০২)। অন্যদিকে, ছই দেওয়া বা ছই ছাড়া, যে কোনো খেয়া নৌকায় চড়ে বধূ কখনো যায় বাপের বাড়ি, কখনো শ্বশুরবাড়ি। জোবেদ আলীর তিন জোয়ান ছেলে নদীর ওপারের জমি চাষের জন্য ডিঙি নৌকায় চড়ে সেখানে যায়। তিতাসপাড়ের জেলে পরিবারগুলোর মাছ ধরে হাটে বিক্রির প্রয়োজনে 'বাড়ি পিছু একটা করিয়া নৌকা ঘাটে বাঁধা থাকে' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪১২)। ঋতুর বৈচিত্র্যময় পরিক্রমায় লোকসমাজের বর্ণাঢ্য উৎসবে-আয়োজনেও নৌকার উপস্থিতি থেকে প্রতীয়মান হয়, এটি তাদের বহমান সংস্কৃতিতে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে—

> রঙ মানুষের মনে মনে। তারা তাদের নৌকাগুলিকেও সাজায়। বউ-ঝিরা ছোট থলিতে আবির নেয়, আর নেয় ধানদূর্বা। জলে পায়ের পাতা ডুবাইয়া থালিখানা আগাইয়া দেয়। নৌকাতে যে

> পুরুষ থাকে সে থালির আবীর নৌকার মাঝের গুরায় আর গলুইয়ে নিষ্ঠার সহিত মাখিয়া দেয়। ধানদূর্বাগুলি দুই অঙ্গুলি তুলিয়া ভক্তিভরে আবির মাখানো জায়গাটুকুর উপর রাখে। এই সময়ে বউ জোকার দেয়। সে-আবিরের রাগে তিতাসের বুকেও রঙের খেলা জাগে। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪১৩)

মালো পরিবারের পুরুষদের বিয়ের পূর্বেই নিজের নৌকা ও জাল কেনার বন্দোবস্ত করতে হয়। নতুবা কনের পিতা তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে চায় না। সুবলের বাপ গগন মালো এ শর্তে সম্মত হয়ে তবেই বিয়ে করেছিল। কিন্তু তা বাস্তবায়নে ব্যর্থ হওয়ায় তাকে আজীবন অন্যের নৌকায় মজুরির বিনিময়ে কাজ করে সংসার চালাতে হয়। সেকারণে সুবলের মা তাকে সুযোগ পেলেই খোটা দেয়– 'এমন টুলাইন্যা গিরস্তি কত দিন চালাইবা! নাও করবা, জাল করবা, সাউকারি কইরা সংসার চালাইবা। এই কথা আমার বাপের কাছে তিন সত্য কইরা তবে ত আমারে বিয়া করতে পারছ। স্মরণ হয় না কেন? ... খাইবা বুড়াকালে পরের লাথি উষ্টা' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪১৫)। ফলে তার ছেলে সুবল বাপের মৃত্যুর পর বন্ধু কিশোরের নৌকায় 'মাথা তোলা' হয়ে মাছ ধরার কাজ নেয়। এরপর তারা একদিন অভিজ্ঞ বৃদ্ধ তিলকচাঁদকে নিয়ে নৌকা সাজায় প্রবাসে যাত্রার জন্য। যেহেতু বড় নদীর বুকে বহুদূরের পথ পাড়ি দিয়ে গন্তব্যে পৌঁছতে হবে, তাই 'তারা পুরানো ছই নতুন করিল, নৌকা ডাঙায় তুলিয়া গাবকালি মাখাইল। জালগুলিকে কড়া গাব খাওয়াইয়া তিনদিন বিশ্রাম দিল। অতিরিক্ত কিছু বাঁশ আর দড়াদড়িও জোগাড় করিল' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪১৬)। প্রবাসযাত্রার একপর্যায়ে তারা যখন ভৈরব বন্দরে যাত্রাবিরতি করে, সেখানেও দেখা মেলে 'নানা ব্যবসায়ের অসংখ্য নৌকা। কোনো নৌকাই বেকার বসিয়া নাই। সব নৌকার লোক কর্ম-চঞ্চল। নৌকার অন্ত নাই' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪১৭)। সারারাত নৌকায় যাত্রার পর পরদিন ভোরে তারা নয়াকান্দা গ্রামে হাজির হয়। কিশোরদের সঙ্গে আলাপকালে তাদের একজন জানায়, তারা আগে পশ্চিমপাড়ের জনৈক জমিদারের গ্রামে থাকলেও তার স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিবাদে এ স্থানে ত্রিশ-চল্লিশ ঘর মালো পরিবার বসতি গড়ে তুলেছে। যদিও এ পাড়া থেকে স্থানীয় হাটবাজার দূরে, তবু এখানকার বাসিন্দারা নৌকায় চড়েই সাংসারিক কাজকর্ম ও মাছ ধরার বন্দোবস্ত করে। প্রবাসযাত্রা শেষে নিজ গ্রামে ফেরার পথে কিশোরের নৌকা যখন মেঘনার মোহনাসংলগ্ন খাড়িতে যাত্রাবিরতি করে, 'সেখানে অনেক নৌকার সমারোহ। তার বেশির ভাগ ধান-বেপারী, কাঁঠাল-বেপারী, পাতিল-বেপারীর নৌকা। সকলেই এখানে এক রাতের জন্য আশ্রয় নিয়াছে' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৩৮)। কিশোরের স্ত্রী ছেলে অনন্তকে নিয়ে আশ্রয়লাভের জন্য স্বামীর গ্রামে আসে । পথে অনন্ত তিতাসপাড়ের মালোপাড়ার যে দৃশ্য দেখে, সেখানেও নৌকার উপস্থিতি লক্ষণীয়– 'একটির পর একটি করিয়া বাঁধা নৌকা। সব নৌকা একই আকারের, একই গড়নের। সারি সারি বাঁশের খুঁটি পোঁতা আছে। তারই একটির সঙ্গে একটি করিয়া নৌকা বাঁধা। নৌকার পেছনের দিকে এক একটা ছই। ছইয়ের দুই দিকই খোলা' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৪৪)। এ উপন্যাসের দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ পরিচ্ছেদ 'জন্ম মৃত্যু বিবাহ'-তে 'জিয়লের ক্ষেপ' দিতে গিয়ে কালোবরণের কর্মচারী সুবলের নৌকা চাপা পড়ে মৃত্যুর মর্মান্তিক বিবরণ রয়েছে। ঝড়ের তোড়ে নদীতীরে সেই নৌকাটি যখন আছড়ে পড়ার অবস্থা হয়, তা প্রতিহত করতে কালোবরণ তাকে আদেশ দেয় লগি নিয়ে তীরে লাফিয়ে নৌকা ঠেকাতে। অন্যদেরও সুবলের সঙ্গে সহযোগিতার কথা ছিল। কিন্তু তারা তা না করায় একাকী সুবলের পক্ষে এত বড় নৌকাকে ঝড়ের মধ্যে সামলানো সম্ভব হয়নি। ফলে সুবল সেই নৌকার তলে চাপা পড়ে প্রাণ হারায়। এ উপন্যাসের 'তিন' অধ্যায়ের 'রামধনু' পরিচ্ছেদে মুসলমান কৃষক ও আলুচাষি কাদির এবং তার ছেলে ছাদিরের আলুবোঝাই নৌকাডুবির প্রসঙ্গ রূপায়িত। তাদের বিপন্ন মুহূর্তে জেলে বনমালী

ও ধনঞ্জয় নিজেদের মাছ ধরার নৌকা নিয়ে এগিয়ে এসে পরিস্থিতি সামলায়। এ ঘটনায় হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও অসাম্প্রদায়িক মনোভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। এ পরিচ্ছেদে লক্ষণীয়, মা-বাপ হারা অসহায় এতিম বালক অনন্ত বনমালীর নিকট আশ্রয় লাভের আশায় বাজারের ঘাটে অপেক্ষা করে। কিন্তু বনমালী দিনের পর দিন ব্যস্ত থাকায় তার হাটের দিকে আসা হয় না। এমতাবস্থায় দারিদ্র্যের পীড়নে জর্জরিত বাসন্তী ও তার পরিবারের নিকট থেকে আশ্রয় হারিয়ে অনন্ত অবশেষে খালের মুখে ফেলে রাখা মস্তবড় একটি ভাঙা নৌকায় আশ্রয় নেয়। এর পেছন দিকে রয়েছে কয়েকটা পালিশ করা কিছু পাটাতন, ফলে সেখানে থাকলে রোদবৃষ্টির কবল থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। নৌকাকে কেন্দ্র করে তিতাসপাড়ের গোকর্ণঘাট, নয়ানপুর, আমিনপুর, বিরামপুর, গোসাইপুর, নবীনগর, রাধানগর, কেষ্টনগর, মনপুরা প্রভৃতি গ্রামের বাসিন্দাদের মধ্যে কোলাহল ও উচ্ছ্বাস জেগে ওঠে বর্ষাকালে। কারণ এসময় নদনদী-বিল, দিঘি বর্ষার পানিতে থইথই করে বলে নৌকাবাইচের আয়োজন করা হয়। এ উপন্যাসের একটি দীর্ঘ পরিচ্ছেদের শিরোনাম, 'রাঙানাও' যা থেকে অনুধাবন করা যায় তিতাসপাড়ের বাসিন্দাদের জীবনে নৌকার ভূমিকা। এটি যে তাদের নিত্যদিনের কর্ম সম্পাদন ও জীবিকার বাহন, যাতায়াতের অবলম্বন হিসেবেই শুধু ব্যবহৃত হয় না, বরং একে ঘিরে তাদের চিত্তবিনোদন ও আমোদ লাভের সুযোগও খেলার মাধ্যমে ঘটে থাকে, তা প্রতীয়মান হয়। বাইচে বা দৌড়ের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য নৌকার মালিক তার দলের সংগীদের নিয়ে নৌকা চালানোর তালিম নেয়। পুরাতন নৌকার মেরামত ও রং করার কাজটিও এ উপলক্ষ্যে চলতে থাকে। সকলের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য গান-বাজনাযোগে একে ঘিরে বালকবালিকাদের ঔৎসুক্য যে অপরিসীম, তা বিবৃত হয়েছে অনন্তের দৃষ্টিকোণ থেকে—

> রাঙা নাও। ... নৌকাটি তিতাস পার হইয়া দূরের একখানা পল্লীর দিকে রোখ করিয়াছে। ... নৌকা সাজাইয়া রঙ করাইয়া লোকজন লইয়া তালিম দিতে গিয়াছিল। ... সাপের মত হিস্ হিস্ করিয়া চলিয়াছিল, ঐ-গাঁয়ে উহা থামিতেই পারে না। সারা গায়ে লতাপাতা সাপ ময়ূরের ছবি লইয়া রঙিন দেহ তার একের পর এক পল্লী পাশ কাটাইয়া আর হাজার হাজার ছেলেমেয়ের মন পাগল করিয়া ছুটিয়াই চলিয়াছে। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৫১৮–৫১৯)

বিরামপুর গ্রামের সম্পন্ন গৃহস্থ কাদিরের বিবাহিত ছেলে ছাদিরের নৌকাবাইচে অংশগ্রহণের উদ্যোগ ও এ সংক্রান্ত কর্মতৎপরতার সূত্রে 'রাঙা নাও' পরিচ্ছেদে প্রকাশিত হয়েছে নৌকাবাইচকে ঘিরে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে তিতাসপাড়ের বাসিন্দাদের ভাবাবেগের স্বরূপ। ছাদির নৌকাবাইচে অংশগ্রহণের জন্য পাট বিক্রির চারশ টাকা দিয়ে বড়ো নৌকা বানানোর অনুমতি চায় কাদিরের কাছে। কাদির এ প্রস্তাব বিনা যুক্তিতে মেনে নিতে চায়নি। কিন্তু ছাদির তাকে যুক্তি দেখায়, আশেপাশের অন্য সব গ্রামের মানুষের নৌকাকে পরাস্ত করে বিজয়ী হওয়ার সম্মান শুধু তার পরিবারের নয়, বরং সমগ্র বিরামপুর গ্রামের। বিপুল টাকা খরচ করে বানানো নৌকা নৌকাবাইচের পর কী কাজে লাগবে, কাদির জানতে চাইলে ছাদির প্রত্যুত্তরে বলে, 'বর্ষার যে কয়মাস ক্ষেতেখামারে পানি থাকিবে, এ নৌকা লইয়া বিলে গিয়া বোঝাই ভরতি ঘাস কাটিয়া আনা যাইবে গাই-গরুর জন্য ...বিলের পানি শুকাইয়া গেলে ... গেরাপি দিয়া তারে তিতাসের পানিতে ডুবাইয়া রাখিব, তার পেটে কতগুলি ডালপালা রাখিয়া দিব, আশ্রয় পাইয়া মাছেরা আসিয়া জমিবে; তখন সময় সময় জল সেঁচিয়া সে মাছ ডোলা ভরিয়া বাড়িতে আনিব' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৫২৭)। ভাদ্র মাসের প্রথম দিন বিকেলে তিতাসের বুকে নৌকাবাইচের আয়োজন করা হয়। এতে পুরস্কার হিসেবে নির্ধারিত ছিল মেডেল, পিতলের

কলসি ও একটি বড়ো খাসি। সেদিন সকালেই কাদিরের বাড়িতে গ্রামের তরুণ চাষিরা সমবেত হয়। তারপর তারা রাঙা বৈঠা নিয়ে নৌকা চালনার তালিম গ্রহণের জন্য নতুন নৌকা নিয়ে বিলে নামে। তারা বুঝতে পারে, 'সব লোকে একযোগে বৈঠা মারলে সাপের মত হিস হিস করিয়া চলে, শিকারীর তীরের মত সাঁ সাঁ করিয়া চলে, গাঁঙের সোতের মত কলকল করিয়া' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৫৩৩) নৌকাটি চলে। দুপুরের আহারের পর ছাদিরের নৌকার দুই পাশে দুই সারি লোক বৈঠা নিয়ে বসে। তাদের মাঝে কয়েকটি তক্তার ওপর মাস্তুলের মত একটি ছোটো খুঁটিকে আশ্রয় করে কয়েকজন প্রবীণ ব্যক্তি কয়েকটি ঢোল, করতাল ও লাঠি নিয়ে নৌকায় ওঠে। তারপর তারা ইসলামের বীরপুরুষ আলীর নাম স্মরণপূর্বক নৌযাত্রা শুরু করে। তিতাস নদীর অপেক্ষাকৃত চওড়া অংশে নৌকাবাইচের আয়োজন করা হয়। সেখানে হাজার হাজার ছোটো বড়ো ছইওয়ালা নৌকা খুঁটিতে আবদ্ধ। ক্রীড়ামোদী লোকজন এসব নৌকায় চড়ে ভিড় জমায়। নদীর ঠিক মাঝখানে প্রায় একমাইল বিস্তৃত স্থানে এ খেলা অনুষ্ঠিত হয়। বেলা পড়ার পরই বিভিন্ন নৌকায় নানা সুরে সারিগান গাওয়ার হিড়িক পরে। কিন্তু নৌকাবাইচকে ঘিরে প্রতি বছরই এক গ্রামের মানুষের সঙ্গে অন্য গ্রামের মানুষের সংঘর্ষ বাঁধে। এক্ষেত্রে কখনো পুরাতন বিবাদের জের, কখনো বা খেলায় জয়ী হবার প্রচেষ্টা, কখনো বা অন্যের সুন্দর নৌকা ধ্বংস করার মনোভাব প্রভৃতি এক্ষেত্রে দায়ী। সেই সঙ্গে নৌকাতেই লাঠি ও বাঁশ থাকায় একদলের সঙ্গে অন্যদলের মারামারিও অনিবার্য হয়ে পড়ে সেই পরিস্থিতিতে। প্রতি বছরই এরূপ ঘটনা ঘটে। এতে অনেকেই আহত, নিহত হয়। প্রতিপক্ষের নৃশংসতার কারণে ছাদিরের নৌকা বিধ্বস্ত হয়। অপরিচিত প্রতিপক্ষের আকস্মিক আক্রমণে হতভম্ব ছাদির এ ধরনের ঘটনার সম্মুখীন হবার কারণ অনুধাবন করতে পারেনি। নদীতে বিপন্ন অবস্থায় তাকে বনমালী উদ্ধার করে। উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে তিতাসপাড়ের বাসিন্দাদের প্রাত্যহিক জীবন ও সংস্কৃতিতে নৌকার গুরুত্ব অনুধাবন করা চলে।

১১. লোকশিল্প

এ উপন্যাসে লোকশিল্প হিসেবে বাঙালি গ্রামীণ নারীসমাজে প্রচলিত সূচিশিল্প ও আলপনার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ রয়েছে। তবে 'শিল্প' অর্থে নয়, বরং জীবিকা নির্বাহের অবলম্বন এবং ধর্মাচারের অংশ হিসেবে এসবের প্রসঙ্গ রয়েছে। যেমন 'তিতাস একটি নদীর নাম' পরিচ্ছেদে জোবেদ আলীর গৃহকাজে নিযুক্ত কামলা করমালীর স্ত্রী সারদিন থেকে গভীর রাত পর্যন্ত বাড়ি বাড়ি কাঁথা সেলাই করে। সে এ কাজ করে কিছু অর্থ পায়। তবে সেলাইয়ের কাজ করতে গিয়ে তার হাত সুঁইয়ের ফোঁড়ে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়। করমালীর সংলাপে প্রকাশিত হয়েছে স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসাসিক্ত বেদনার্তি– 'আমি ছিঁড়া খাঁথায় গাও এলাইয়া দিয়া পথের পানে চাইয়া থাকি। সে তখন পরের বাড়ি খাঁথা সিলাই করে, আর সে সুঁইচের ফোঁড় আমার বুকে আইয়া বিন্ধে' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪১২)। তাছাড়া মালোপাড়ার নারীরা যে বয়ন শিল্পে পটু এবং ঘরে বসেই সুতা বানিয়ে মাছ ধরার জাল তৈরি করে, এ প্রসঙ্গে আমরা দৃষ্টিপাত করেছি লোকপ্রযুক্তি প্রসঙ্গে আলাপকালে। 'প্রবাস খণ্ড' পরিচ্ছেদে মাঘমণ্ডলের ব্রত পালনের বিবরণ রয়েছে। দীননাথ মালোর মেয়ে বাসন্তী এ ব্রত পালন করে। ব্রতের অংশ হিসেবে বাড়ির উঠানে আলপনা আঁকতে হয়। কিন্তু বাসন্তী এ কাজে অনভিজ্ঞ ও অপটু বলে প্রতিবেশী কিশোর ও সুবলকে দিয়ে তার মা আলপনা আঁকিয়ে নেয়। তারা হাতি, ঘোড়া ও পাখি আঁকে। একারণে বাসন্তী বেশ উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। কারণ 'সারা মালোপাড়ার কারো উঠানে হাতিঘোড়া নাই; কেবল তারই উঠানে থাকিবে।

শিল্পীদের অপটু হস্তচালনার দিকে মুগ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া বাসন্তী এক সময় খুশিতে হাসিয়া উঠিল' (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪১৪)।

১২. লোকভাষা

এ উপন্যাসে তিতাসপাড়ের মালো, কৃষক ও বেদে সম্প্রদায়ের লোকভাষা ফুটিয়ে তোলার সতর্ক প্রয়াস লক্ষণীয় কুশীলবদের প্রাত্যহিক জীবনে প্রচলিত সংলাপে, কথোপকথনের বিশিষ্ট ভঙ্গিতে, বাগ্‌ধারা ও অলংকারাশ্রিত বাক্যবিন্যাসে। লেখক এতদঞ্চলের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ভাষিক পরিমণ্ডল সম্পর্কে যে সম্যক অবহিত ছিলেন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। লোকভাষার বিশেষ মেজাজ, ভঙ্গি ও পরিসর এ উপন্যাসে একেবারেই বাস্তবানুগ রূপ পেয়েছে তাঁর লেখায়। বিশেষ ধরনের উচ্চারণ, দেহভঙ্গিমা এবং আঞ্চলিকতার প্রভাবজাত পরিবর্তিত উচ্চারণ কুশীলবদের আলাপে, বাগ্‌বিন্যাসে প্রতিফলিত হওয়ায় পাঠকের কাছে এর বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে কোনো ধরনের সন্দেহের উদ্রেক ঘটে না। এ ভাষাকে আশ্রয় করেই তাদের নিত্যদিনের ওঠাবসা ও বৈষয়িক কর্ম সম্পন্ন হয়। আবার একটি নির্দিষ্ট লোকসমাজের বিশেষ চারিত্র্যও লোকভাষাকে ভিত্তি করেই প্রামাণ্য রূপ পায়। লোকভাষায় নারী-পুরুষ ভেদে উচ্চারণ ও রূপগত ভিন্নতা, স্বতন্ত্র মনোবাস্তবতা ও আর্থ-সামাজিক অবস্থানের প্রতিফলন ঘটায় একে ভিত্তি করে সেই সমাজের স্বরূপ অনুধাবন করা চলে। পাশাপাশি, এ ভাষাকে ভিত্তি করে রচিত লোকসাহিত্যের ভান্ডারেও বিধৃত হয় সমাজভুক্ত বাসিন্দাদের সমষ্টিমানসের পরিচয়। তিতাসপাড়ের লোকভাষা যে অন্য অঞ্চলে প্রচলিত ভাষা থেকে ভিন্ন, এবং এ ভিন্নতাকে যে লেখক যথাযথ গুরুত্বসহযোগে এ উপন্যাসে বাঙ্ময় করে তুলেছেন, তা বুঝে উঠতে আমরা কুশীলবদের শব্দভান্ডার ও বাগ্‌ধারা বিবেচনায় রেখেছি।

১৩.১ শব্দভান্ডার

এ উপন্যাসের আদ্যন্ত তিতাস-তীরবর্তী লোকসমাজে প্রচলিত দেশজ ও কথ্য, আঞ্চলিক শব্দরাশির প্রয়োগ ঘটেছে। এর কিছু শব্দের ব্যবহার শুধু মালো ও কৃষক গোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অথচ উপন্যাসে বিবৃত বর্ণনার পাশাপাশি কুশীলবদের ভাবের আদানপ্রদানের প্রয়োজনহেতু এসব শব্দরাশির প্রয়োগ প্রাসঙ্গিক, যথাযথ; এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে বিকল্পহীন।

বিশেষণ– চোরা, কাঙাল, তাতিয়া, উবু, সবুজিমা, পচা, নাদুসনুদুস, টুকটুকে, ছোবল, চওড়া, হলদে, টুকিটাকি, কোনাকুণি, ঢঙ্গী, গলানো প্রভৃতি।

ক্রিয়া– ভাঙ্গে, তাতায়, পাড়াইতে, সাঁতরাইতে, ফোলায়, মাতিয়াছে, ফসকাইয়াছিল, বাহিয়া, ডুবিয়া, টানিয়া, মাজে, কাচে, ঢালাইতেছে, ঠেলা, ঝিমাইতেছে, নেতাইয়া, ঠেকাইয়া, খেকাইয়া, এলাইয়া, গুটাইতেছে, চুবাইয়া, গুঁজিয়া, রসাইয়া, চাপিয়া, ঘসাইয়া, গুলাইয়া, খেলাইয়া, ঝুলানো, ভানিয়া, গুজরায়, প্রভৃতি।

দেশজ শব্দ– মরাই, ব্যাপারী, ছিপ, পাল, কাঁকন, বাঁশ, সাঁকো, ঠেলাজাল, কুটুম, নিকারী, গাঙ, ঠেলা, চিপা, ডোলা, খেউ, চুনো-পুঁটি, খানাডোবা, ডালা, ভিটা, জটা, প্যাঁচ, বেড়া, ছই, আল, ডিঙি, মাড়, ঘাস, ভূষি, খইল, জোকার, খরা, ঠেলা, মটকি, চরকি, টেকো, তকলি প্রভৃতি।

ধ্বন্যাত্মক অব্যয়– গম্ গম্, কনকনে, ঠন্‌ঠনে, ভুরভুরি, টগবগ, কিলবিল, ধুকধুকানি, ছপছপ, ছল্যাৎ, ঝপাঝপ, সাঁ সাঁ, তাতা থৈতৈ, ঠকাঠক, গুনগুন, গল গল, ঝা ঝা ঝম্‌ঝম্, ঠকাঠক, ধপাস্ ধপাস্, হিসহিস, ফিসফাস, দুরুদুরু প্রভৃতি।

দ্বিরুক্ত পদ– ছুঁইয়া ছুঁইয়া, নাচিতে নাচিতে, টিপিয়া টিপিয়া, খাঁ খাঁ, ধূধূ, টুকিটাকি, ভানতে ভানতে, ফকফক, ভেনভেন, হিস হিস, দড়াদড়ি, ঠনঠন প্রভৃতি।

আঞ্চলিকভাবে পরিবর্তিত শব্দরাশি– শুকিয়ে>শুখাইয়া, বিজন>বিজনা, লেজ>ল্যাজ, উঠে>উইঠ্যা, পরে>পিন্ধে, ঝগড়া>কাইজ্যা, ছিনিয়ে>ছিনাইয়া, সাঝি>নাইয়া, উড়ে>উইড়া প্রভৃতি।

১৩.২ বাগ্‌ধারা

ক. মালোরা যখন দুই চোখে অন্ধকার দেখে তখন তারা যায় বোধাইর বাড়িতে। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪০১)

খ. আমার ভাই অত কথায় কথায় শ্বাস পড়ে না। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪১২)

গ. সুবল 'মাথাতোলা' হইয়া কিশোরের নৌকায় গিয়া উঠিল। (অচিন্ত্য, ২০১১: ৪১৫)

ঘ. কোনো লাভ হইবে না বলিয়া ডাকাতের মন ভিজাইতে হইবে। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪১৬)

ঙ. কিছুদিন আগে পিছে দুজনেরই নাও-জালে হাতেখড়ি হইল। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪১৬)

চ. আরো সুবলা, তুই বুঝবি কি! তারা মুখে মিঠা দেখায়, চোখ রাখে মাইয়া-লোকের উপর। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪১৭)

ছ. দেশদেশান্তরের মাছ, এই সব বিলে আসর জমায়। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪২৯)

জ. তোমাকে কি মধ্যে মধ্যে ভূতে ভর করে? (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৩৬)

ঝ. একদিন সে মুখে ফুলচন্দন পড়িল। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৩৭)

ঞ. এই তো জগৎবেড় ফেলিয়াছে। এদিকে রাঘব-বোয়াল আছে মনের আনন্দে। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৪৮)

ট. কি সোনার মানুষ গো দিদি কত আদর করে আমারে আর আনন্দেরে। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৪৮)

ঠ. দশ সের সূতা লইয়া সে অথৈ জলে পড়িল। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৪৯)

ড. বিয়া হইল গগনের পুত সুবলার সাথে। সেই সুবলা মরল। ছেমড়ি তার নামের জয়ঢাক হইয়া রহিল। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৪৯)

ঢ. অ মহনের মা, আজ যে দেখি আঘাটাতে চন্দ্র উদয়। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৪৯)

ণ. এই যে কানা মানুষ ... তিনি লোকের বিচার করিতে গিয়া 'শ্বশুরের বিছানায় বউ শোয়ায়, জামাইর বিছানায় শাশুড়ী শোয়ায়'। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৫১)

ত. কথা কি আর আমরা বুঝতে পারি না। হাঁ করতে আলাজিহ্বার টের পাই। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৫২)

থ. তিন বিবাহের তিন ছেলের বাপড হইয়া শ্যামসুন্দর বেপারী যদি আবার বিবাহ করে তো পূবের চাঁদ পশ্চিমে উদয় হইবে। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৬২)

দ. সে নিজেও সব জানিয়া-শুনিয়া জড়ভরত হইয়া আছে। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৪৭৯)

ধ. মালোদের পুরোহিত ডুমুরের ফুলের মত দুর্লভ। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৫১৪)

ন. একেবারে হাতে-বৈঠা-ঘাটে-নাও অবস্থা। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৫২৫)

প. উপরওয়ালা ফেলিয়াছে চৌদ্দ সানকির তলায়, কাঁদিয়া কি করিব। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৫৫০)

ফ. আগে নিজের ঘর সামলা। তারপর পরের তরকারিতে লবণ দিতে আসিস। (অচিন্ত্য, ২০১১ : ৫৫০) বাগধারান অর্থযোগে ব্যাখ্যা দিতে হবে।

অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতিভুক্ত উপাদানসমূহের ভান্ডারে সমৃদ্ধ কালজয়ী উপন্যাস। নিছক সাহিত্যচর্চার প্রচেষ্টা হিসেবে এটি লিখিত হয়নি। বরং তিনি নিজে যেহেতু তিতাসপাড়ের মালো সম্প্রদায়ের বাসিন্দা ছিলেন, তাই এতদঞ্চলের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতি প্রগাঢ় মমত্ব, আন্তরিকতা এবং দায়বোধ তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল তাদের প্রাত্যহিক জীবনপ্রবাহের বিশ্বস্ত শিল্পভাষ্য উপস্থাপনে। মালো সম্প্রদায়ের গোষ্ঠীজীবনের বিশিষ্ট গড়ন, বিস্তার ও ভাঙনের যে অনুপুঙ্খ চালচিত্র তিনি রূপায়িত করেছেন, তা মোটেই কল্পিত বা বাস্তবতা বিবর্জিত নয়। বরং ব্যক্তিজীবনে আহরিত নিগূঢ় অভিজ্ঞতা, তাদের সঙ্গে অন্তর্গত সম্পৃক্ততা এবং মানবিক মূল্যবোধের তাড়নাহেতু তিনি এখানকার লোকমানুষের চালচিত্রকে গ্রন্থনায় উজ্জীবিত হয়েছেন, যার প্রতিফলন এর আদ্যন্ত লক্ষণীয়। বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতির বৈচিত্র্যময় ভান্ডারকে সফলভাবে শিল্পায়নের যে দৃষ্টান্ত তিনি স্থাপন করেছেন, তা এক কথায় অনন্যরহিত। লোকমানুষের প্রতিনিধি হিসেবে তাঁর এ কৃতিত্ব বাংলা সাহিত্যে অত্যুজ্জ্বল মর্যাদায় অধিষ্ঠিত।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. এ উপন্যাস সম্পর্কে সমালোচকদের অভিমত–

ক. তিতাসকে একসময় আমি বলেছিলাম 'নদীর পাঁচালী। ... আমি দেখতে পাই 'তিতাস একটি নদীর নাম' এবং তার স্রষ্টার অচ্ছেদ্য অন্বয়ের নিগূঢ় যোগাযোগকে। কোনও ব্যক্তি, তা সে তিনি যত বড়ো শিল্পীই হোন না কেন, বাইরে থেকে গিয়ে 'তিতাস একটি নদীর নাম' লিখতে পারেন না। কাহিনী এবং কাহিনীকার দুজনকেই সেই সুনির্দিষ্ট জলমাটি হাওয়া থেকে, সেখানকার সংস্কার থেকে, বিশ্বাস থেকে, জীবন-জীবিকার ঘাম কাদা মেখে এবং ছেনে উঠে আসতে হবে। বিষয় ও ব্যক্তিগুলি দীর্ঘকাল ধরে তাঁর কাছে অপ্রত্যাখ্যেয় হয়ে থাকে, তার পরে তার প্রকাশ অনিবার্য হবে। তিতাসের সঙ্গে জড়িত, গ্রথিত জীবন এই উপন্যাসের বিষয়। (সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'মুখপাত', *তিতাস একটি নদীর নাম : প্রসঙ্গ ও অনুষঙ্গ*, সুশান্ত দাস সম্পাদিত, পাণ্ডুলিপি, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. অনুল্লেখিত)

খ. 'তিতাস একটি নদীর নাম' যখন প্রথম ধারাবাহিকভাবে মাসিক মোহাম্মদী-তে প্রকাশিত হচ্ছিল, তখনই তা সুধী পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, পরে গ্রন্থাকারে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হলে পাঠকমহলে বেশ সাড়া জাগায়। ১৩৬৩-তে প্রথম প্রকাশের পর এ গ্রন্থের বেশ কয়েকটি সংস্করণ হয়েছে, হয়েছে এর কাহিনীর চিত্ররূপও। কাজেই ভূমিকায় প্রকাশক যে লিখেছিলেন– 'আমাদের বন্ধু অদ্বৈত দীর্ঘজীবী হয় নাই, হয়ত তাঁহার তিতাসের কাহিনী দীর্ঘজীবী হইবে।' ... লেখক আরো গ্রন্থ লিখেছিলেন, কিন্তু বোধ করি এই গ্রন্থেই তিনি নিজেকে পরিপূর্ণরূপে দিতে পেরেছিলেন বলেই– 'অদ্বৈতের সমগ্র সাহিত্য-সাধনার মধ্যে এই গ্রন্থটিই তাঁহার সর্বোৎকৃষ্ট কীর্তি' হতে পেরেছে। (গুণময় মান্না, 'অদ্বৈত মল্লবর্মণের তিতাস', *তিতাস একটি নদীর নাম : প্রসঙ্গ ও অনুষঙ্গ*, সুশান্ত দাস সম্পাদিত, *পাণ্ডুলিপি*, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ৬৪)

গ. একটি উপন্যাস রচনা করেই শ্রী অদ্বৈত মল্লবর্মণ বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে আছেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অন্তর্গত গোকর্ণ গ্রামের ধীবর সম্প্রদায়ের জীবনচর্যা তাঁর 'তিতাস একটি নদীর নাম' গ্রন্থে যে-আন্তরিক মমতায় রূপায়িত হয়েছে তার তুলনা বাংলা কথাসাহিত্যে খুব বেশী নেই। দরিদ্র ধীবর পরিবারের সন্তান অদ্বৈত মল্লবর্মণ তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও সুগভীর অন্তর্দৃষ্টির বলে এক উপেক্ষিত সমাজের জীবন সংগ্রামের কাহিনীকে দিয়েছেন অবিনশ্বরতা। (আবু হেনা মোস্তফা কামাল, উদ্ধৃত, শান্তনু কায়সার, *অদ্বৈত মল্লবর্মণ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৬, 'প্রসঙ্গ-কথা', পৃষ্ঠা অনুল্লেখিত)

ঘ. 'তিতাসে'র মানবিক ও সার্বজনীন আবেদন এবং প্রেক্ষাপট সত্ত্বেও এর স্থানীয় রূপ ও বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায় তার শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ ও স্বাক্ষর। তিতাসকে কেন্দ্র করে এই জনপদে যে কালচার ট্রেটের জন্ম হয়েছে তারও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত লক্ষণ প্রকাশিত এই উপন্যাসে। উদাহরণ হিসেবে তিতাস-কেন্দ্রিক নৌকা বাইচের উল্লেখ করা যেতে পারে। এই উপন্যাসের তৃতীয় খণ্ডের সম্পূর্ণ দ্বিতীয় পর্বটি নৌকা বাইচের ওপর রচিত। এই পর্বটির শিরোনাম 'রাঙা নাও।' কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ যা তা হচ্ছে, ঔপন্যাসিক এখানে নৌকা বাইচকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করেননি। নৌকা বাইচের প্রস্তুতি থেকে পরিণতি পর্যন্ত পুরো বিষয়টির সঙ্গে ঔপন্যাসিক এখানে জীবনের প্রবহমানতাকে যুক্ত করেছেন। ফলে একদিকে যেমন কাদিরের তৃতীয় পুরুষ পর্যন্ত ঘটনার প্রেক্ষাপট বর্ণিত হয়েছে তেমনি উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র অনন্তের জীবনেরও নানা বাঁকের ইঙ্গিত এর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। সেইসঙ্গে বর্ণিত অঞ্চলের সমস্ত প্রেক্ষাপট এসে মিলেছে ঘটনা বিন্যাসের সঙ্গে। তাতে নৌকা বাইচের সাংস্কৃতিকতা জীবনেরই ভিন্নরূপে পরিবর্তিত হয়েছে। নৌকা বাইচের সময় গীত গানগুলি আঞ্চলিকতাকে ধারণ করা সত্ত্বেও কিংবা সে কারণেই হয়ে ওঠে হার্দ্য উচ্চারণ। (শান্তনু কায়সার, *অদ্বৈত মল্লবর্মণ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮)

ঙ. এক ধরনের পূর্ব-প্রস্তুতি ছাড়া কখনওই লেখা সম্ভব হতে পারে না, অন্তত 'তিতাস' গোত্রের উপন্যাসের ক্ষেত্রে তা স্বীকার করতেই হবে। আমাদের বলার বিষয়টি এখানে, উপন্যাস কাগজে-কলমে লেখার বহু আগেই তিনি একটি উপন্যাসের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। মহৎ কর্মের ক্ষেত্রে যেটা জরুরি। তিনি বহু আগেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন মালো জীবন আর সেই সঙ্গে লোকসংস্কৃতি সংগ্রহে হয়ে উঠেছিলেন পারদর্শী। (দেবীপ্রসাদ ঘোষ, *অদ্বৈত মল্লবর্মণ : এক ভিন্ন প্রতিস্রোত*, গাঙচিল, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ১৮)

চ. 'তিতাস একটি নদীর নাম' বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এই মহৎ উপন্যাসখানি ও তার স্রষ্টা অদ্বৈত মল্লবর্মণ একে অন্যের পরিপূরক। উপন্যাসখানিকে এক পাশে সরিয়ে রেখে ব্যক্তিমানুষ অদ্বৈতকে ভাবতে কষ্ট হয়। আবার স্রষ্টা অদ্বৈতকে আমরা যদি স্মৃতিতে আড়াল করি তা হলে তিতাসের জল আর তার কূলের সভ্যতার এককালের ধারা ভুলতে বসি। সৃষ্টির সাথে স্রষ্টা একাত্ম, অভিন্ন। একের অস্তিত্বের সঙ্গে অন্যের অস্তিত্ব মিশে আছে। ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে বিরল ঘটনা। নেই বললেই চলে। ... তিতাস কূলের জীবন চর্যার শরিক অদ্বৈত। সেই জীবন চর্যাকে অমরত্ব দিয়েছেন, অর্থবহ করেছেন। 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসকে কেন্দ্রমূলে রেখে হয়েছে সেই কাজ। ... তিতাস ও অদ্বৈত মিলেমিশে অন্ত্যজ বাঙলার এক চলমান দলিল— অনন্তকালের চাকার আবর্তিত ইতিহাস। (মনোহর বিশ্বাস, *ভিন্নচোখে প্রবন্ধমালা*, চতুর্থ দুনিয়া, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ১৩)

ছ. তিতাস-তীরের গোকর্ণ গ্রামের যে-পাড়ায় অদ্বৈত মল্লবর্মণের বেড়ে ওঠা, ভদ্রভাষায় তার নাম মালোপাড়া হলেও, সেটি 'গাবরদের পাড়া' বলেই বহুল পরিচিত। শ্রমজীবী অন্তেবাসী জেলে সম্প্রদায়ের প্রতি অবজ্ঞা থেকেই 'ভদ্র'লোকেরা এ নাম সৃষ্টি করেছেন। জন্মসূত্রে এই 'গাবরদের পাড়া'র লোক বলে অদ্বৈতের শৈশব-কৈশোর-যৌবন কী বিড়ম্বনা ও অসহায়তার মধ্যে অতিক্রান্ত হয়েছে, তা সহজেই অনুমেয়। এই অবজ্ঞা আর বিড়ম্বনাই উত্তরকালে প্রাকৃত জীবনের কথান্যাস নির্মাণে অদ্বৈতকে অনুপ্রাণিত করেছে। কেবল তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাসেই নয়, তাঁর আর

> সব প্রধান রচনাতেও আমরা প্রত্যক্ষ করি প্রাকৃত জীবন ও কৌম সংস্কৃতির প্রতি গভীর ভালোবাসার কথা। ... তাঁর জীবন ও সাধনার কেন্দ্রীয় প্রবণতাই হচ্ছে কৌমজীবনের অঙ্গীকার। (বিশ্বজিৎ ঘোষ, 'তিতাস একটি নদীর নাম : জল ও জীবনের বিকল্প নন্দন', *লোকপুরাণ, জনসমাজ ও কথাশিল্প*, নান্দনিক, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ১২৬–১২৭)

> জ. অদ্বৈত স্বাতন্ত্র্যের সাধনাকেই বড় করে দেখতে চেয়েছেন। বস্তুত, গোকর্ণ গ্রাম ব্রাহ্মণবেড়িয়া ও তিতাস অঞ্চলের ভূমিপুত্র, তিতাসের সঙ্গে রক্তের সম্পর্কে সম্পর্কিত, নদীলিপ্ত জনপদের অভিজ্ঞতায় বিত্তবান ও আর্থিক দিক থেকে প্রবল পশ্চাৎপদ শ্রেণীর, মালো কমিউনিটির অন্তর্ভুক্ত, অদ্বৈত মল্লবর্মণের আত্মবিশ্বাস ও মৌলিকত্বের অভিজ্ঞানে বিশিষ্ট ধারণাই ... নিজেকে নিজের মতন করে গড়ে তোলায় প্রাণিত করেছে আর তারই ফসল 'তিতাস একটি নদীর নাম'। ... অদ্বৈত'র বড় হয়ে ওঠা, গড়ে ওঠা এই জেলে বা মালো জীবনের ভিতর থেকেই। তাই তাঁর তিতাস হয়ে ওঠে 'জেলে জীবনের মহাকাব্য'। জলমজুর জেলে মালো সম্প্রদায়ের মানুষ অদ্বৈত, প্রকৃত অর্থে, ব্রাত্য-জীবনের কথাকার। ... (এ) উপন্যাস অদ্বৈত মল্লবর্মণের অভিজ্ঞতার দলিল ... জীবন-অভিজ্ঞতাকে শিল্প-অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ করে একটি অসামান্য সাহিত্যকর্ম উপহার দেওয়া তাঁর প্রতিভারই পরিচয়বহ। (শুভঙ্কর ঘোষ, 'ব্রাত্য জীবনের কথকতা : কথাকার অদ্বৈত মল্লবর্মণ', *কথাশিল্পের বহুমাত্রিকতা*, প্রতিভাস, কলকাতা, ২০০২, পৃ. ৯৫–৯৬)

২. সমালোচকদের অভিমত–

> ক. 'নবশক্তি'র সম্পাদক হিসেবে কাজ করার সময় অদ্বৈত মল্লবর্মণ বেশ কিছু নিবন্ধ লিখেছেন, যেগুলিতে তাঁর লোকসংস্কৃতি চর্চার নিবিড় আগ্রহের পরিচয় বর্তমান। ... লৌকিক উপাদান উপন্যাসে যখন উপস্থাপিত হয় তখন তা সাধারণভাবে আঞ্চলিকতার অনুষঙ্গী হয়ে ওঠে। তিতাস একটি নদীর নাম-এ যেহেতু আঞ্চলিক উপাদান ব্যবহৃত হয়েছে তাই লোকজীবন প্রবাহের অন্তর্গত হয়ে এসেছে লোকসংস্কৃতির উপস্থাপনা। এক্ষেত্রে আমরা লক্ষ করি অদ্বৈতের দুটি মন কাজ করে গেছে : ১. সংগ্রাহক ও বিশ্লেষক-মন, আর, ২. সৃজনশীল মন। 'নবশক্তি'-তে প্রথম স্তরের আর তিতাস একটি নদীর নাম-এ দ্বিতীয় স্তরের অদ্বৈতকে খুঁজে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে লোকজীবন আসে গূঢ়তর তাৎপর্য অঙ্গীকার করে।" (অচিন্ত্য বিশ্বাস, *অদ্বৈত মল্লবর্মণ ও তিতাস একটি নদীর নাম*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৫, ১২৮–১২৯)

তিনি এ উপন্যাসে অদ্বৈতের সংগৃহীত বিভিন্ন গানকে সরাসরি ব্যবহারের একটি তালিকা দিয়েছেন। এসবের অন্তর্গত সাতটি গান এ উপন্যাসে রূপায়িত হয়েছে।

> খ. অদ্বৈত মল্লবর্মণ কথাসাহিত্যিক হিসেবে সমধিক পরিচিত ও জনপ্রিয় হলেও লোকসংস্কৃতির উপাদান সংগ্রাহক ও গবেষক হিসেবেও তাঁর অবদান কম নয়। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত ছাব্বিশটি প্রবন্ধের মধ্যে আঠারোটি প্রবন্ধ বিশুদ্ধ লোকসংস্কৃতি বিষয়ক। গ্রাম-বাংলা থেকে লোকসংস্কৃতির নানা উপাদান তিনি সংগ্রহ করে প্রবন্ধকারে 'নবশক্তি', 'দেশ', 'আনন্দবাজার', 'মাসিক মোহাম্মদী', 'বঙ্গলক্ষ্মী' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশ করেন। ... কেবলমাত্র লোকসংস্কৃতির উপাদান সংগ্রাহক ও গবেষক হিসেবেই নয়, কথাসাহিত্যিক হিসেবেও অদ্বৈতের বিস্ময়কর প্রতিভার প্রকাশ ঘটেছে। এ প্রসঙ্গে অবশ্যই তাঁর 'তিতাস একটি নদীর নাম' (১৯৫৬) উপন্যাসের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। এই উপন্যাস রচনার ভিত্তি প্রস্তুত হয়েছিল, যখন তিনি অবিভক্ত ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে লোকসংস্কৃতির নানা উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন। পরবর্তীতে যখন তিনি এই উপন্যাস রচনা করেন, তখন বিভিন্ন চরিত্রের কণ্ঠে ত্রিপুরার গ্রাম থেকে সংগ্রহীত লোকসঙ্গীতগুলি সংযোজন করে উপন্যাসটিকে নতুন মাত্রা দান করেছেন। (মিলনকান্তি বিশ্বাস, *অদ্বৈত মল্লবর্মণ ও বাংলার লোকসংস্কৃতি*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পৃ. ১১–১২)

অদ্বৈত মল্লবর্মণ মোট ছাব্বিশটি প্রবন্ধ লিখেছেন, যেগুলোর অধিকাংশই লোকসংস্কৃতি বিষয়ক। এ প্রসঙ্গে জানতে দ্রষ্টব্য : মিলনকান্তি বিশ্বাস, *অদ্বৈত মল্লবর্মণ ও বাংলার লোকসংস্কৃতি*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা : পৃ. ৪৮–৪৯

৩. অদ্বৈতের সুহৃদ সুবোধ চৌধুরী সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন–

> অদ্বৈত মল্লবর্মণের ছিল মানুষ আর প্রকৃতি সম্পর্কে সুগভীর insight। এমনটি আমাদের ছিল না। আমরা দেখেছি দর্শকের মতো, ভালো হয়ত লেগেছে। তবে অদ্বৈত দেখেছেন শিল্পীর চোখে। তাঁর সত্তার সঙ্গে তিতাস ছিল মিশে। এটা পৃথক করতে পারেন নি তিনি, চানও নি। তাঁর উপর ছিল তাঁর উদার দৃষ্টিভঙ্গি। ... প্রথম যখন পাণ্ডুলিপি জমা দিয়েছিলেন, আমি বলেছিলাম– "মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখলেন 'পদ্মানদীর মাঝি' আর কি তোমার বই মানুষ নেবে"? বলেছিলেন অদ্বৈত "সুবোধদা, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বড় artist, master artist, কিন্তু বাওনের পোলা– রোমান্টিক। আর আমি তো জাউলার পোলা" আর কিছু বলেন নি। পরিচয়ের এই প্রত্যক্ষতাই ছিল তাঁর গৌরবের ভিত। (*অদ্বৈত মল্লবর্মণ ও তিতাস একটি নদীর নাম*, প্রকাশক শুভ রহমান, অদ্বৈত মল্লবর্মণ এডুকেশনাল এন্ড কালচারাল সোসাইটি, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা ৮–৯)

৪. এ উপন্যাসে লোকপুরাণ বিস্তৃত পরিসরে শৈল্পিক ভাষ্যরূপ পেয়েছে। মালো জীবনের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অদ্বৈত নিজ সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক গড়ন ও পরিমণ্ডল সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। যে আর্থ-সামাজিক প্রতিবেশ ও ঐতিহ্যকে তিনি জন্ম-পারিবারিক সূত্রে পেয়েছিলেন, তাকে অকৃত্রিমভাবে এ উপন্যাসে তিনি ধারণ করেছেন। শিল্পীর অন্তর্দৃষ্টি আর সংবেদনশীল সামাজিক মানুষের নৈয়ায়িক অবস্থান তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল তিতাসপাড়ের বাসিন্দাদের সামগ্রিক জীবনচর্যা গ্রন্থনায়। তাই প্রকৃতিনির্ভর জীবিকা নির্বাহ আর আদিম ধরনের উৎপাদন ব্যবস্থায় সম্পৃক্ত মানুষের কৌমবদ্ধ সাংস্কৃতিক পরিচয় এ উপন্যাসে নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে উপস্থিত। লোকপুরাণের বর্ণাঢ্য জগতকে তিনি মালোদের প্রত্যক্ষ জীবনবাস্তবতা ও সমষ্টিচেতনার পটভূমি হিসেবে নির্বাচন করেছেন। এ সম্পর্কে দুজন সমালোচকের তাৎপর্যপূর্ণ অভিমত–

> ক. প্রধানত যে তিনটি পুরাণ সংস্কৃতি-জাত আখ্যান তিনি নির্বাচন করেছিলেন তা হলো মনসামঙ্গল গান, দ্বিতীয়টি রাধাকৃষ্ণ কথা এবং তৃতীয়টি তুলনায় আগের দুটির চেয়ে কম শিব-দুর্গা কাহিনী। বিশেষত উদাসীন দেবতা শিব, যিনি চাষ করেন, ভিক্ষে করেন, গাঁজা খান অথচ প্রলয়ঙ্কর মহাদেব কোথাও কোথাও প্রতীকের মতো এসেছেন। ... প্রবাস খণ্ডে যখন কিশোর আর সুবল নৌকা বেয়ে মেঘনা নদীর স্রোতে চলতে চলতে আর এক মালোপাড়ায় গিয়ে নোঙর গড়ল, সেই গ্রামে বিষ্ণু ভক্ত অনেকেই। 'কৃষ্ণমন্ত্রী'দের গ্রাম। যেখানে নিত্য বাক্যালাপে পাঁজি-কীত্তনের শুরু। বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত মদনমোহন, লোলিতাসখী শ্রীমতী রাধিকাকে নিয়েই গড়ে ওঠে এক রসের মানসকুঞ্জ। কিশোর ও সুবল নাম দুটি যেন এই গ্রামে এসে পূর্ণতা পেলো। বৃন্দাবনের কৃষ্ণ শ্যামল কিশোর আর সখা সুবল। যেন আপনা থেকেই মূর্ত হলো কিশোর ও সুবলের মধ্যে। ... অদ্বৈত সেই গ্রামের দোল পূর্ণিমার বর্ণনা দিয়েছেন। ... বৈষ্ণবীয় বাতাবরণ, রাধাকৃষ্ণের প্রেম-বিরহকথার মাধুর্য এই উপন্যাসে যেভাবে ব্যবহৃত হতে দেখি তার লোকায়তিক রূপটি আরও অনেক জায়গাতেই পাই। এখানে উল্লেখ্য একটি কথা– বিষ্ণু বা কৃষ্ণ পৌরাণিক দেবতা হওয়া সত্ত্বেও বাংলার লোকজীবনেরই অন্তর্গত হয়ে গেছে। যা একদা ছিল শিষ্ট সাহিত্য, তা প্রাচীন কালে যখন সমাজের সাহিত্য ছিল প্রধানত শ্রুতি বহির্ভূত, তখন লোকজীবনের মধ্যে প্রবেশ করেছে অনেক গভীরভাবে। তাই রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ব্রাহ্মণ্য নীতি শাসিত শিষ্ট সাহিত্য হলেও তা ভারতের লোকজীবনের অঙ্গ হয়ে গেছে অবিচ্ছেদ্যভাবে। এই দিক থেকে দেখলে অদ্বৈতের উপন্যাসে এই উপাদানটি গৃহীত হয়েছে। পৌরাণিকতায় নয়, লৌকিকতায়। দ্বিতীয়-তৃতীয় খণ্ডে 'জন্ম মৃত্যু বিবাহ' এবং 'রামধনু' অংশে আবার প্রধান হয়ে ওঠে শক্তিদেবতা কালী আর মনসা-কেন্দ্রিক পুজো। যে উপন্যাস জলধারার সঙ্গে সঙ্গে প্রবাহিত হয় সে উপন্যাসে মনসামঙ্গলের স্মৃতি অনিবার্য। 'জন্ম মৃত্যু বিবাহ' অংশে আছে কালীপুজোর অনুষ্ঠানের বর্ণনা। 'রামধনু' অংশে আছে পদ্মাপুরাণ

পাঠ, জালাবিয়া এবং মনসাপূজার বিবরণ। এ সবই মনসামঙ্গলের অনুষঙ্গ। (সুমিতা চক্রবর্তী, 'তিতাস একটি নদীর নাম : ভাষা ও প্রকরণ', *তিতাস একটি নদীর নাম : প্রসঙ্গ ও অনুষঙ্গ*, সুশান্ত দাস সম্পাদিত, পাণ্ডুলিপি, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ৩৩–৩৪)

খ. তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাসের নানা স্থানে মিথিক অনুষঙ্গ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। মিথের সূত্র ধরে আলোচ্য উপন্যাসের ভিন্ন এক তাৎপর্য আবিষ্কার করা সম্ভব। উপন্যাসের তলদেশে ক্রিয়াশীল আছে পৌরাণিক এক দ্বৈধের স্মৃতি। মালোর সন্তান 'জাউলার পোলা' অদ্বৈত মল্লবর্মণের কাছে সে-দ্বৈধের স্মৃতি অজানা থাকার কথা নয়। অজানা যে নয়, তা বোঝা যায় ওই প্রত্ন-উৎসের পৌনঃপুনিক ব্যবহার দেখে। ক্ষত্রিয় পিতা আর বৈশ্য-মাতার মিলন থেকে কৈবর্ত বা মালোদের জন্ম। মহাভারত-এ আছে অন্য এক অনুষঙ্গ। রাজা শান্তনু বা মুনি পরাশরের মতো উচ্চ ও অভিজাত বর্গের সন্তান হয়েও স্বীকৃতির অভাবে মৎস্যজীবী বর্গ সমাজে ছিল উপেক্ষিত। কৈবর্তদের মাঝ থেকে ক্রমে দুটি শাখা সৃষ্টি হয়– হালিয়া দাস তথা চাষি, আর জালিয়া দাস তথা জেলে। পুরাকাহিনীতেও আছে শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে এই দুই শাখার দ্বৈরথের কথা। বক্ষ্যমান উপন্যাসেও দেখা যায়, তিতাসের বুকে চর জেগে উঠলে তার দখল নিয়ে জেলেদের সঙ্গে চাষিদের বিরোধ বাঁধে এবং সে-বিরোধেই ক্রমে শেস হয়ে যায় জেলেরা। তিতাস-তীরের এই কাহিনীতে পুরাকাহিনীর প্রত্নস্মৃতি কী তাহলে অলক্ষ্যে উঁকি দেয়? ... অনন্তের পরিণতির দিক থেকেও পুরাকাহিনীর ভিন্ন এক অনুষঙ্গের দিকে দৃষ্টি দেওয়া যায়। অনন্তের কাছে তিতাসের জন্মবৃত্তান্ত শুনিয়েছিলেন প্রবীণ তিলকচাঁদ, আর নদীর উৎসের ভিন্ন এক মিথকথা অনন্তকে শোনায় উদয়তারা– 'নদীর সির্জন হইয়াছে হিমাইল রাজার দেশে। সেই দেশে স্বর্গে-সংসারে মিলন হইয়াছে। যুধিষ্ঠির মহারাজা সেই দেশে গিয়া তারপর হাঁটিয়া স্বর্গে গেল।' যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণের পশ্চাতেও আছে একই উৎস থেকে জাত দুটি গোষ্ঠীর ভয়াবহ যুদ্ধের প্রত্নস্মৃতি। মহাভারতের 'মৌষল পর্বে' ভয়াবহ যুদ্ধে ধ্বংস হয়েছিল যদুবংশ। তিতাসের তীরে চাষি আর জেলের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে জেলেদের পরাভব ও নিঃশেষ হয়ে যাওয়া কী একালের 'মৌষল পর্ব' নয়? বিশেষত যখন দেখি, নব্য-যুধিষ্ঠির অনন্তও তিতাসের তীর ধরে যেতে চায় হিমাইল রাজার দেশে, সেখান থেকে পায়ে হেঁটে স্বর্গলোকে। ... কেবল যুধিষ্ঠির নয়, উদয়তারা অনন্তকে শোনায় বেহুলার গল্পও– যুধিষ্ঠিরের মতো বেহুলাও উজান ঠেলে সশরীরে উপস্থিত হয়েছিল স্বর্গে। বেহুলার গল্প শোনাতে শোনাতে উদয়তারা অনন্তকে জিজ্ঞাসা করেছিল– 'তুই কি লখাই পণ্ডিত?' অনন্তের কাছে উদয়তারার কেন এই প্রশ্ন? অনন্ত কি লখিন্দরের মতোই পরিস্থিতির শিকার, উচ্চবর্গ-নিচবর্গের দ্বৈরথের পরিণাম? অনন্তের প্রতি উদয়তারার প্রশ্নের মাঝেই লুকিয়ে আছে আলোচ্য প্রতিবেদনের ভিন্ন এক মিথিক অনুবর্তন। ... কেবল উদয়তারার বয়ানেই নয়, এ উপন্যাসের নানা জায়গাতেই আছে পদ্মাপুরাণের কথা, বেহুলার কথা, আছে সারা শ্রাবণ মাস জুড়ে পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গল কাব্য-পাঠের কথা। উপন্যাসে যুধিষ্ঠিরের পুরাকথা উত্তরণের সংকেতগর্ভ, বেহুলার বৃত্তান্ত পুনরুজ্জীবনের প্রতিভাস। প্রথম গল্পস্রোত ধরে অনন্ত যাত্রা করে আরেক 'হিমাইল রাজার দেশ' শহরে, শিক্ষিত হতে; আর দ্বিতীয় স্রোত ধরে সে প্রত্যাবর্তন করে গোকর্ণ গাঁয়ে, মৃতকল্প অনন্তবালার খোঁজে। কিন্তু বিশ শতকের অনন্ত যুধিষ্ঠির নয়, নয় বেহুলাও–তাই কিছুই করতে পারে না সে; নিরাসক্তভাবে কেবল দেখতে পায় এ কালের 'মৌষল পর্ব' মালোকৌমের ধ্বংস ও বিনষ্টি। এভাবে দেখলে, একথা বলতেই পারা যায়, তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাসে পুরাণকথা বিনির্মাণের ব্যঞ্জনায় অভিষিক্ত। অদ্বৈতের অনন্ত প্রতিকল্পে যুধিষ্ঠির সঞ্চার করে উত্তরণের ইঙ্গিত, আর বেহুলা পুনরুজ্জীবনের সংকেত। (বিশ্বজিৎ ঘোষ, *লোকপুরাণ, জনসমাজ ও কথাশিল্প*, নান্দনিক, ঢাকা, ২০১২ পৃ. ১৪৩–১৪৪)

৫. সমালোচকের অভিমত–

বাংলাদেশের নদীনির্ভর জনগণের কতগুলো নিজস্ব সম্পদ আছে; এদের অন্যতম হলো লোকগান। লোকসঙ্গীত প্রান্তিক এই জনগোষ্ঠীর জীবনের মহার্ঘ সম্পদ। নদী- নৌকা-মাঝি-এই

> তিনটি অনুষঙ্গে স্বতঃই উল্লেখযোগ্য হয়ে ওঠে উদাত্ত কণ্ঠের গান। তাইতো দেখা যায়, কোনো ঘাটে একরাতের জন্য আশ্রয়রত নানা নৌকা থেকে বিচিত্র সঙ্গীতের মূর্ছনা ধ্বনিত হয়। কোনো নৌকায় গাওয়া হয় মুর্শিদি-বাউল, কোনো নৌকায় বারোমাসি গান, কোনো নৌকায় চলে পুঁথিপাঠ, আবার কোনো নৌকায় থাকে কেচ্ছার আয়োজন। এছাড়া, ভাটির টানে নৌকা ভাসিয়ে মাঝিরা গায় ভাটিয়ালি কিংবা নৌকাবাইচের সময় বৈঠাপতনের সঙ্গে তাল রেখে সারিগান। ... নদী-নৌকা-জাল-নির্ভর মালোজীবনের কাহিনী লিখতে গিয়ে অদ্বৈত গানের ডালি দিয়ে সাজিয়েছেন এই উপন্যাসটিকে। ... তাদের দৈনন্দিন জীবনের নানা অনুষঙ্গ, নানা ব্রতকথা, পূজা-পার্বণাদি এই উপন্যাসে সঙ্গীত নির্ভর হয়ে পরিবেশিত হয়েছে। এই উপন্যাসে অদ্বৈত মল্লবর্মণ সম্পূর্ণ এবং আংশিক কলি নিয়ে মোট ৫৯টি গান ব্যবহার করেছেন। ... গানগুলোর অধিকাংশই মালোদের সামগ্রিক জীবনচর্যার সঙ্গে ছড়িয়ে আছে। তাদের প্রাণের গভীর হতেই এই গানগুলোর উৎসারণ ঘটেছে। (হরিশংকর জলদাস, *নদীভিত্তিক বাংলা উপন্যাস ও কৈবর্তজনজীবন*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮১–১৮৩)

৬. নাইয়র প্রথা সম্পর্কে বিস্তৃত জানতে দ্রষ্টব্য : রাজিয়া সুলতানা, 'বাংলা সাহিত্যে নাইয়র-এর সামাজিক উৎস', *সাহিত্য বীক্ষণ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা : ১৩১–১৩৯

৭. সমালোচকের অভিমত–

> 'তিতাসে'র মানবিক ও সার্বজনীন আবেদন এবং প্রেক্ষাপট সত্ত্বেও এর স্থানীয় রূপ ও বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায় তার শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ ও স্বাক্ষর। তিতাসকে কেন্দ্র করে এই জনপদে যে কালচার ট্রেটের জন্ম হয়েছে তারও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত লক্ষণ প্রকাশিত এই উপন্যাসে। উদাহরণ হিসেবে তিতাস-কেন্দ্রিক নৌকা বাইচের উল্লেখ করা যেতে পারে। এই উপন্যাসের তৃতীয় খণ্ডের সম্পূর্ণ দ্বিতীয় পর্বটি নৌকা বাইচের ওপর রচিত। এই পর্বটির শিরোনাম 'রাঙা নাও।' কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ যা তা হচ্ছে, ঔপন্যাসিক এখানে নৌকা বাইচকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করেননি। নৌকা বাইচের প্রস্তুতি থেকে পরিণতি পর্যন্ত পুরো বিষয়টির সঙ্গে ঔপন্যাসিক এখানে জীবনের প্রবহমানতাকে যুক্ত করেছেন। ফলে একদিকে যেমন কাদিরের তৃতীয় পুরুষ পর্যন্ত ঘটনার প্রেক্ষাপট বর্ণিত হয়েছে তেমনি উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র অনন্তের জীবনেরও নানা বাঁকের ইঙ্গিত এর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। সেইসঙ্গে বর্ণিত অঞ্চলের সমস্ত প্রেক্ষাপট এসে মিলেছে ঘটনা বিন্যাসের সঙ্গে। তাতে নৌকা বাইচের সাংস্কৃতিকতা জীবনেরই ভিন্নরূপে পরিবর্তিত হয়েছে। নৌকা বাইচের সময় গীত গানগুলি আঞ্চলিকতাকে ধারণ করা সত্ত্বেও কিংবা সে কারণেই হয়ে ওঠে হার্দ্য উচ্চারণ। (শান্তনু কায়সার, *অদ্বৈত মল্লবর্মণ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ১৮)

৮. এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য : ক. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *বাংলার ব্রত*, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৯৪৩ খ. প্রদ্যোত ঘোষ, *বাংলার লোকশিল্প*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০৪ গ. খগেশকিরণ তালুকদার, *বাংলার লোকায়ত শিল্পকলা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৭ ঘ. মিহির ভট্টাচার্য ও দীপঙ্কর ঘোষ (সম্পাদিত), *বঙ্গীয় শিল্প পরিচয়*, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, ২০০৪।

৯. সমালোচক জানিয়েছেন–

> উপন্যাসে লোকায়ত জনগোষ্ঠীকে জীবন্ত করে তোলার পথে সর্বাধিক সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় সংলাপের ভাষা। বিবৃতির ভাষায় লেখক নিজস্ব বাকশৈলী ব্যবহার করতে পারেন। প্রয়োজনে কিছু আঞ্চলিক শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে নিয়ে আসতে পারেন স্থানীয় বর্ণাভা। কিন্তু সংলাপের ব্যবহার ভিন্ন। সেখানে, যদি লেখকের জানাও থাকে সেই জন-গোষ্ঠীর মুখের ভাষা স্বরূপ, তবু তা যথাযথভাবে উপস্থাপিত করতে সব সময় তিনি সক্ষম হন না। কারণ, সে ভাষা বোধগম্য হবে না তাঁর উপন্যাসের পাঠকদের। আবার পাঠক যে ভাষায় কথা বলে, সেই নাগরিক ও শিষ্ট চলিত বাংলাও ব্যবহার করা সম্ভব নয়। তেমন হলে উপন্যাসের স্বাভাবিকতা বজায় থাকবে না।

> মানুষগুলি হবে না জীবন্ত। ... অদ্বৈত মল্লবর্মণ কাজ করবার চেষ্টা করেন বিশেষ শব্দের প্রয়োগে, ক্রিয়াপদের বিশেষ ধরনের এবং স্থানীয় প্রবাদ-প্রবচনের প্রয়োগে। ... অদ্বৈত মল্লবর্মণের মাতৃভাষাই ছিল সেই মালোপাড়ার ভাষা। কাজেই সমস্যা তাঁর কিছু ছিল না। (সুমিতা চক্রবর্তী, 'তিতাস একটি নদীর নাম : ভাষা ও প্রকরণ', *তিতাস একটি নদীর নাম : প্রসঙ্গ ও অনুষঙ্গ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯–৪০)

সহায়কপঞ্জি

অচিন্ত্য বিশ্বাস (২০০৫)। *অদ্বৈত মল্লবর্মণ ও তিতাস একটি নদীর নাম*। রত্নাবলী, কলকাতা।

অচিন্ত্য বিশ্বাস *সম্পা.* (২০১১)। *অদ্বৈত মল্লবর্মণ রচনাসমগ্র*। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯৪৩)। *বাংলার ব্রত*। বিশ্বভারতী, কলকাতা।

খগেশকিরণ তালুকদার (১৯৮৭)। *বাংলার লোকায়ত শিল্পকলা*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

দেবীপ্রসাদ ঘোষ (২০০৮)। *অদ্বৈত মল্লবর্মণ : এক ভিন্ন প্রতিস্রোত*। গাঙচিল, কলকাতা।

প্রদ্যোত ঘোষ (২০০৪)। *বাংলার লোকশিল্প*। পুস্তক বিপণি, কলকাতা।

বিশ্বজিৎ ঘোষ (২০১২)। *লোকপুরাণ, জনসমাজ ও কথাশিল্প*। নান্দনিক, ঢাকা।

মনোহর বিশ্বাস (২০০৩)। *ভিন্নচোখে প্রবন্ধমালা*। চতুর্থ দুনিয়া, কলকাতা।

মিলনকান্তি বিশ্বাস (২০১৪)। *অদ্বৈত মল্লবর্মণ ও বাংলার লোকসংস্কৃতি*। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা।

মিহির ভট্টাচার্য ও দীপঙ্কর ঘোষ *সম্পা.* (২০০৪)। *বঙ্গীয় শিল্প পরিচয়*। লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা।

রাজিয়া সুলতানা (১৯৯৮)। *সাহিত্য বীক্ষণ*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

শান্তনু কায়সার (১৯৯৬)। *অদ্বৈত মল্লবর্মণ*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

শুভঙ্কর ঘোষ (২০০২)। *কথাশিল্পের বহুমাত্রিকতা*। প্রতিভাস, কলকাতা।

শুভ রহমান [প্রকাশক] (১৯৯৯)। *অদ্বৈত মল্লবর্মণ ও তিতাস একটি নদীর নাম*। অদ্বৈত মল্লবর্মণ এডুকেশনাল এ্যান্ড কালচারাল সোসাইটি, ঢাকা।

সুশান্ত দাস *সম্পা.* (১৯৯৯)। *তিতাস একটি নদীর নাম : প্রসঙ্গ ও অনুষঙ্গ*। পাণ্ডুলিপি, কলকাতা।

হরিশংকর জলদাস (২০০৮)। *নদীভিত্তিক বাংলা উপন্যাস ও কৈবর্ত জনজীবন*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।